লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly
The Ahmadi
Since 1922

প্রকাশনার ৯৯ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

নবপর্যায় ৮৪ বর্ষ | ৩য় সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ | ০৫ মহরম, ১৪৪৩ হিজরি | ১৫ জহুর ১৪০০ হি. শা. | ১৫ আগস্ট, ২০২১ ঈসাব্দ

জলসা সালানা, ইউ. কে. ২০২১-এ হুযূর (আই.)-এর পতাকা উত্তোলনের পর দোয়া পরিচালনার দৃশ্য

জলসা সালানা, ইউ. কে. ২০২১-এ বিভিন্ন স্থান থেকে অতিথিদের আগমনের দৃশ্য

সম্পাদকীয়

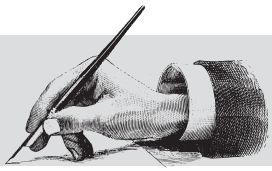

জলসা সালানার প্রভাব

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জলসা সালানায় যোগদানকারী এক ব্যক্তির ওপর এ জলসার যে প্রভাব পড়ে সে সম্পর্কে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম'-এ ছাপা হয়। উক্ত জলসার প্রভাবে বয়আতকৃত ব্যক্তির নাম হযরত মীর নাসের নবাব সাহেব (রা.)। তিনি ১৮৯৩ সালের ২রা জানুয়ারী যে ঘটনা বর্ণনা করেন তার ভাবার্থ অনেকটা এমন:

"হযরত মির্যা সাহেবের ভালভাবে জানা ছিল, আমি তার বিরোধী, আর কেবল বিরোধীই নই বরং মন্দভাষী এবং আমার দ্বারা প্রবঞ্চনার মত ঘটনাও ঘটেছে, এতদসত্ত্বেও আমাকে জলসায় আসতে বলেন এবং জলসায় আসার জন্য কয়েকটি পত্রও প্রেরণ করেন যার মাঝে একটি রেজিষ্ট্রি পত্রও ছিল। যদিও পূর্বে অজ্ঞতাবশত এবং বিরোধিতার কারণে আমার জলসায় যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু মির্যা সাহেবের বার বার অনুরোধের কারণে আমার হৃদয়ে এক প্রেরণা সৃষ্টি হয়। মির্যা সাহেব যদি এতটা আন্তরিকভাবে না লিখতেন তাহলে আমি আদৌ জলসায় যেতাম না এবং সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থেকে যেতাম। তাঁর (আ.) উৎসাহ দেয়াতেই আমি যাই। বর্তমান যুগের মৌলভীরা তো আপন পিতার সাথেও এতটা আন্তরিক এবং সম্মানসূচক আচরণ করে না। আমি ২৭ তারিখ দুপুরের পূর্বে কাদিয়ান গিয়ে উপনীত হই। তখন হযরত মৌলভী হেকীম নুরুদ্দীন সাহেব মির্যা সাহেবের সপক্ষে বক্তব্য রাখছিলেন এবং বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে ছিলেন। হায় পরিতাপ! আমি সবটা শুনতে পারি নি। মানুষের কাছে শুনেছি, খুব উচ্চমার্গের বক্তব্য ছিল। এরপর হামেদ শাহ সাহেব মির্যা সাহেবের সত্যতা ও প্রশংসায় নযম পাঠ করেন। তখনও যেহেতু আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয় নি এবং হৃদয় কলুষ ছিল তাই কোনরূপ আগ্রহ এবং আন্তরিকতার সাথে শুনি নি অথচ খুব উচ্চ পর্যায়ের নযম ছিল। আল্লাহ্ তা'লা উক্ত নযম প্রণেতাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

আমি যখন মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাত করলাম আর তিনি আমার সাথে আন্তরিক ব্যবহার করলেন তখন আমার চিত্ত বিগলিত হল যেন মির্যা সাহেবের সুরমা চক্ষুর শলাকা দ্বারা আমার হৃদয় চক্ষুর পঙ্কিলতা দূর হয়ে গেল আর রাগ ও ক্রোধের স্রোতস্বিনী নদীর পানি শুকাতে থাকল আর আবছা আবছা কিছু সত্য আমার চোখে ধরা পড়তে লাগল এবং ধীরে ধীরে অন্তরের চোখ সুস্থ হয়ে গেল। মির্যা সাহেব ছাড়া আরও কিছু ভাই এ জলসায় উপস্থিত ছিলেন, যাদেরকে প্রথমে আমি তুচ্ছতাচ্ছিল্য এবং বিদ্বেষের চোখে দেখছিলাম, পরে তাদেরকেই ভালবাসা এবং আন্তরিকতার চোখে দেখতে শুরু করি আর অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকল যে, গতদিন জলসায় উপস্থিত লোকদের মাঝে যারা মির্যা সাহেবের অধিক প্রিয় ছিল তাদেরকেও আমার দৃষ্টিতে সম্মানিত মনে হতে লাগল। আসরের পর মির্যা সাহেব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন যা শুনে আমার সকল সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং অন্তরের চোখ খুলে গেল। দ্বিতীয় দিন সকালে এক অমৃতসরী উকিল সাহেব নিজের অদ্ভুত ঘটনা শুনালেন যা দ্বারা মির্যা সাহেবের উন্নত মানের কারামত (অলৌকিক নিদর্শন) সাব্যস্ত হয়, যার সারাংশ হল, উকিল সাহেব পূর্বে সুন্নতী জামা'তের মুসলমান ছিলেন। যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং সরকারী পড়াশুনা শেষ করলেন তখন ধর্মীয় জ্ঞান না থাকা আর তৎকালীন ওলামা এবং পীরদের কথা-কাজে মিল না থাকায় তার হৃদয়ে প্রশ্ন দেখা দিল এবং কোথাও সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় কয়েকবার ধর্ম পরিবর্তন করেন। প্রথমে সুন্নি থেকে শিয়া হন। সেখানে তাবাররা আর তা'যিয়া ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না। এরপর আরিয়া হলেন এবং কয়েকদিন সেখানের স্বাদ নিলেন। কিন্তু সেখানেও শান্তি পেলেন না। এরপর ব্রাহ্মণ হলেন। তাদের পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। কিন্তু সেখানেও স্বাদ লাভ হল না। এরপর প্রকৃতিবাদী হলেন কিন্তু অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বা খোদার ভালবাসা বা কোন নূর কোথাও দৃষ্টিগোচর হল না। অবশেষে মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাত হল এবং খুব রূঢ় আচরণ করলেন কিন্তু মির্যা সাহেব আন্তরিকতার সাথে, বিনম্রভাবে কথা বললেন আর এমন উত্তম আদর্শ দেখালেন ফলে ইসলামের প্রতি তার পূর্ণ ভক্তি সৃষ্টি হল এবং নামাযীও হয়ে গেলেন। অতএব তিনি মির্যা সাহেবের আন্তরিক অনুসারী হয়ে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রকৃত অনুসারী হয়ে গেলেন।

এ জলসায় তিনশ'র অধিক ভদ্র ও পুণ্যবান লোক একত্রিত হয়েছিলেন যাদের চেহারা থেকে মুসলমানী নূর ঝরে পড়ছিল। ধনী, দরিদ্র, নবাব, ইঞ্জিনিয়ার, দারোগা, তহশিলদার, জমিদার, সওদাগর, হেকিম– মোটকথা প্রত্যেক ধরনের লোক উপস্থিত ছিলেন। হ্যাঁ, কতক মৌলভীও ছিলেন কিন্তু খোদাভীরু ও বিনীত মৌলভী। মৌলভীর সাথে খোদাভীরু এবং বিনীত শব্দ ব্যবহার করলাম তবে এটি মির্যা সাহেবের কারামত তথা মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাত করে মৌলভীও খোদাভীরু হয়ে যায়। মির্যা সাহেব স্বস্থানে বসা অথচ তাঁর কাছে লাহোর, অমৃতসর, পেশাওয়ার, কাশ্মির, জম্মু, সিয়ালকোট, কপুরথলা, লুধিয়ানা, বোম্বে, উত্তর প্রদেশ এবং দক্ষিণ প্রদেশ, উধ, পবিত্র মক্কা ইত্যাদি জায়গা থেকে লোক ঘর থেকে শস্যবস্তা বেঁধে নিয়ে চলে এসেছে। *(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃষ্ঠা: ৬৩৭-৬৪২)*

সূচিপত্র

১৫ আগস্ট ২০২১

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৫

অমৃতবাণী ৬

০৬ আগস্ট, ২০২১ যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে জলসা সালানায় প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ৭
বিষয়: *মেহমান ও মেযবানের দায়দায়িত্ব*

০৬ আগস্ট, ২০২১ যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে জলসা সালানায় প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **মুআয়েনাহ সেশনে কর্মীদের উদ্দেশ্যে উপদেশবাণী** ১৪

০৬ আগস্ট, ২০২১ যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে জলসা সালানায় প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **উদ্বোধনী বক্তৃতা** ১৬
বিষয়: *তাকওয়া, পরহেযগারী, কোমল হৃদয় ও ভ্রাতৃত্ববোধ*

০৭ আগস্ট, ২০২১ যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে জলসা সালানায় প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা** ২৩
বিষয়: *ইসলামে নারীর অধিকার, ইসলামে বিবাহ-শাদী, পারিবারিক অধিকার, নারীদের সাথে, ন্যায়বিচার, নারী-পুরুষের আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা*

নযম ৩০
হযরত নবাব মোবারাকা বেগম সাহেবা (রা.)

০৭ আগস্ট, ২০২১ যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে জলসা সালানায় প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **বক্তৃতা** ৩২
বিষয়: *বছরব্যাপী জামা'তের কর্মকাণ্ডের পরিসংখ্যান*

০৮ আগস্ট, ২০২১ যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে জলসা সালানায় প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **সমাপনী বক্তৃতা** ৩৯
বিষয়: *ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের অধিকার*

আহ্‌মদীয়া জলসা সালানার প্রেক্ষাপট ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৫১

জলসা সালানার গুরুত্ব ও কল্যাণ ৫৩

জলসা সালানা, ইউ. কে. ২০২১-এ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে MTA'র মাধ্যমে যোগদান ৫৬

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত ৬০

প্রচ্ছদ পরিচিতি: **হাদীকাতুল মাহ্‌দী** *(সংগ্রহ: www.alislam.org)*

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

فَاِذَا بَلَغۡنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمۡسِكُوۡهُنَّ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ فَارِقُوۡهُنَّ بِمَعۡرُوۡفٍ وَّاَشۡهِدُوۡا ذَوَىۡ عَدۡلٍ مِّنۡكُمۡ وَاَقِيۡمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمۡ يُوۡعَظُ بِهٖ مَنۡ كَانَ يُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ وَمَنۡ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجۡعَلۡ لَّهٗ مَخۡرَجًا ۙ﴿۳﴾

وَّيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُ ؕ وَمَنۡ يَّتَوَكَّلۡ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسۡبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمۡرِهٖ ؕ قَدۡ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىۡءٍ قَدۡرًا ﴿۴﴾

(সূরা আত্ তালাক: ৩-৪)

৩। অতঃপর যখন তারা তাদের নির্ধারিত ইদ্দতের শেষ সীমায় উপনীত হয় তখন তোমরা তাদেরকে হয় ন্যায়-সঙ্গতভাবে রাখ অথবা ন্যায়-সংগতভাবে বিদায় দাও এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখ, আর আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা কর। সেই ব্যক্তিকে এই উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে। আর যে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে– তার জন্য আল্লাহ্ কোন না কোন উদ্ধারের পথ করে দিবেন।

৪। এবং তিনি তাকে এমন দিক থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। আর যে আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করে, আল্লাহ্ তা'র জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ অভিপ্রায় বাস্তবায়ন করে থাকেন। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের পরিমাণ সুনিশ্চিত নির্ধারণ করে রেখেছেন।

তফসীর

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

"তোমাদের মাঝে কেউ যদি আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে আর তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করে এবং কোন প্রমাণহীন সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত না নেয়, তবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে তার সমস্ত সমস্যা থেকে পরিত্রাণ দান করবেন। এছাড়া তাকে এমনসব মাধ্যমে রিয্‌ক দান করবেন যে, এই রিয্‌ক কীভাবে আসল তা সে ধারণাও করতে পারবে না।"
(আরিয়া ধার্‌ম, রূহানী খাযায়েন, দশম খণ্ড, পৃ: ৫৩)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অন্য জায়গায় বলেন:

"আল্লাহ্‌ভীতি ও পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু উন্নতি করেছি- সর্বদা আমাদের এদিকে মনোযোগী হওয়া উচিত। আর এর মানদণ্ড হচ্ছে পবিত্র কুরআন। আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে একটি চিহ্ন এটিও রেখেছেন যে, তাদেরকে জাগতিক ব্যস্ততা থেকে মুক্ত করে তিনি স্বয়ং তাদের কাজের জিম্মাদার হয়ে যান। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,"ওয়া মাইয়াত্তাকিল্লাহা ইয়াজআল লাহু মাখরাজা, ওয়া

ইয়ারযুকহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব" যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার সমস্ত বিপদ-আপদে তার জন্য নিষ্কৃতির সঠিক উপায় বলে দেন আর তাকে সেখান থেকে রিয্‌ক দেন যেখান থেকে সে রিয্‌ক লাভের ধারণাও করতে পারে না। আর মুত্তাকীর একটি চিহ্ন হল, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অযৌক্তিক চাহিদার মুখাপেক্ষী করেন না। উদাহরণস্বরূপ, একজন দোকানদার মনে করে, মিথ্যা বলা ছাড়া আর ব্যবসাই চলবে না। এজন্য সে মিথ্যা বলা থেকে বিরত হয় না, এটিকে তার অপারগতা হিসেবে প্রকাশ করে, কিন্তু তার এই কর্ম কোনভাবেই পছন্দনীয় নয়। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মুত্তাকীদের সুরক্ষাকারী হয়ে থাকেন এবং সত্যের বিপরীতে যাওয়ার পরিস্থিতি থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যখন কেউ আল্লাহ্ তা'লাকে পরিত্যাগ করে তখন আল্লাহ্ তা'লাও তাকে পরিত্যাগ করেন। রহমান আল্লাহ্ যখন কাউকে পরিত্যাগ করেন তখন তার সাথে শয়তান নিঃসন্দেহে সম্পর্ক গড়ে তোলে। আল্লাহ্ তা'লাকে দুর্বল ভাববে না। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী এক সত্তা। কোন কাজে যখন তার ওপর ভরসা করবে তখন অবশ্যই তিনি তোমার সাহায্যকারী হবেন। 'ওয়া মাইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ফাহুয়া হাসবুহু' (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রাখে, আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান) এই আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম যারা সম্বোধিত, তারা ছিলেন ধার্মিক, তাদের সব চিন্তাচেতনা শুধুমাত্র ধর্মীয় কাজকে কেন্দ্র করেই ছিল। তারা তাদের জাগতিক কাজকর্মের ভার আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাদের আশ্বস্ত করেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। অতএব, তাকওয়ার বরকতসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের সেসব সমস্যাবলী দূরীভূত করে দেন যা তাদের ধর্মীয় কাজসমূহের প্রতিবন্ধক। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা বিশেষভাবে মুত্তাকীদের রিয্‌ক প্রদান করে থাকেন। এখানে আমি ধর্মীয় জ্ঞানের রিয্‌ক সম্পর্কে উল্লেখ করব। নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-কে সমস্ত জগতের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। যার মাঝে আহলে কিতাব, দার্শনিক, অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের ধর্মীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ব্যুৎপত্তি অর্জনকারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু তিনি (সা.) আধ্যাত্মিক রিয্‌ক হিসেবে ধর্মীয় জ্ঞানে এতটাই সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন যার ফলে তিনি (সা.) তাদের ওপর প্রাধান্য পেয়ে তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ করেছিলেন। এটি ছিল আধ্যাত্মিক রিযিকের অনন্য দৃষ্টান্ত।" *(জলসা সালানা ১৮৯৭ সনের রিপোর্ট, পৃ: ৩৪-৩৫)*

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অন্যস্থানে বলেন:

"মানুষ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত থাকে এবং তার বিভিন্ন চাহিদা থাকে। মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধান ও চাহিদা পূর্ণ করার জন্যও তাকওয়াকেই পন্থা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। স্বল্প আয় ও অন্যান্য সংকীর্ণতা থেকে পরিত্রাণের পথ হল 'তাকওয়া'।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "ওয়া মাইয়াত্তাকিল্লাহা ইয়াজআল লাহু মাখরাজা, ওয়া ইয়ারযুকহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব" তিনি মুত্তাকীদের জন্য তাদের সমস্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ সৃষ্টি করে দেন এবং সমস্যাবলী থেকে মুক্ত হবার জন্য অদৃশ্য থেকে সরঞ্জাম সরবরাহ করেন। তাকে এমনভাবে রিয্‌ক প্রদান করেন যে, সে তা বুঝতেও পারে না।

এখন চিন্তা করে দেখ, মানুষের এই পৃথিবীতে আর কি চাহিদাই বা থাকতে পারে! এই পৃথিবীতে মানুষের সর্বোচ্চ চাহিদা এটিই যে, সে সুখে-শান্তিতে থাকবে। আর এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি পথই নির্ধারণ করেছেন যাকে তাকওয়ার পথ বলা হয়। আর এর অন্য প্রতিশব্দ কুরআন করীমের পথ অথবা এর নাম তিনি সিরাতে মুস্তাকীম রেখেছেন।

কেউ যেন এটি না বলে, কাফেরদের কাছেও সহায়-সম্পত্তি, ধন-সম্পদ থাকে আর তারা নিজেদের সম্পদ নিয়ে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকে। আমি তোমাদের প্রকৃত সত্য জানাচ্ছি, তারা দুনিয়ার দৃষ্টিতে বরং নীচ জগৎপূজারী ও লৌকিকতা প্রদর্শনকারী লোকদের দৃষ্টিতে নিজেদেরকে সুখী হিসেবে উপস্থাপন করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত থাকে। তোমরা তাদের বাহ্যিক চেহারা দেখেছ কিন্তু আমি এমন লোকদের হৃদয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে তাদেরকে আগুনে দহন হতে ও বন্দীদের ন্যায় শিকলাবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পেয়েছি। *(আল হাকাম, পঞ্চম খণ্ড, নম্বর: ১১, ২৪ মার্চ ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ: ০৩)*

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের দপ্তরে একজন "অফিসসহকারী কাম মোয়াজ্জিন ও একজন খাদেম (গেইট কিপার)" নিয়োগের জন্য আহমদী প্রার্থীদের নিকট থেকে স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।

অফিসসহকারী কাম মোয়াজ্জিন পদের জন্য নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ. এস. সি পাশ এবং কম্পিউটার দক্ষতা হিসেবে এম. এস. অফিস এবং বাংলা ও ইংরেজি টাইপিং জানা আবশ্যক। এছাড়া সুলিলত কণ্ঠে আযান দেওয়ার দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

খাদেম (গেইট কিপার) পদের জন্য নূন্যতম ৮ম শ্রেণি পাশ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

স্থানীয় আমীর অথবা প্রেসিডেন্ট সাহেবের সুপারিশসহ আ.মু.জা. চট্টগ্রাম বরাবর লিখিত আবেদপত্র আগামী ১৫ই অক্টোবর ২০২১-এর মধ্যে চট্টগ্রাম জামা'তের দপ্তরে পৌঁছাতে হবে।

বেতন ও ভাতা আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদন পাঠানোর ঠিকানা:
আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম
১নং কে. বি. ফজলুল কাদের রোড, চকবাজার
চট্টগ্রাম-৪২০৩, বাংলাদেশ

আবেদনের শেষ তারিখ : ১৫ই অক্টোবর, ২০২১

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوا رَبِيعَةُ. قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ. وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ. قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ. قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ. وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ. وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ. وَقَالَ احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন: আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল যখন মহানবী (সা.)-এর দরবারে এসে পৌঁছল, তখন তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন: 'তোমরা কোন্ গোত্রের? অথবা বললেন, কোন্ গোত্রের প্রতিনিধিদল? তারা উত্তরে বলল, 'রাবীআ গোত্রের'। তিনি (সা.) বললেন, স্বাগত সেই গোত্র বা সেই প্রতিনিধিদলের জন্য যারা অপমান ও অনুতাপবিহীন। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! হারাম মাস ব্যতীত অন্য কোন সময় আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। আমাদের এবং আপনাদের মাঝে অমুসলিম 'মুযার' গোত্রটি অন্তরায় হয়ে আছে। তাই আমাদের কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিন যাতে আমরা গিয়ে বাকি লোকদের বলতে পারি এবং আমরা যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তারা পানপাত্রের বিষয়েও জিজ্ঞেস করল। তখন তিনি (সা.) তাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ দিলেন এবং চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করলেন। তাদেরকে এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে তিনি (সা.) বললেন: এক আল্লাহ্‌র প্রতি কীভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় তা কি তোমরা অবগত আছ? তাঁরা বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি (সা.) বললেন, তা হচ্ছে সাক্ষ্য দেয়া, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এবং নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, রমযানে রোযা রাখা এবং তোমাদের গনীমতের সম্পদ থেকে রসূলের জন্য এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে জমা করা।" এছাড়া তিনি (সা.) তাদেরকে চারটি জিনিস থেকে বিরত থাকতে বললেন আর তা হল, (১) 'হান্তাম' অর্থাৎ মদ তৈরির কলসী যার গলা সবুজ ও গায়ের রং লাল, (২) 'দুব্বা' অর্থাৎ লাউ বা চাল কুমড়ার শুকনো খোল দ্বারা প্রস্তুত মদ্যভাণ্ড, (৩) 'লাকীব' তথা গাছের গুঁড়িতে গর্ত করে মদ বানানোর পাত্রবিশেষ, (৪) 'মোযাফফাত' অর্থাৎ আলকাতরা বা অনুরূপ গাঢ় তৈলাক্ত বস্তু দ্বারা প্রলেপকৃত মদ্যপাত্র। মহানবী (সা.) বললেন, তোমরা এগুলো স্মরণ রাখবে এবং তোমাদের অন্যান্য লোকদের জানিয়ে দিবে। *(সহীহ বুখারী, উপদেশ অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: 'মানার উদ্দেশ্যে উপদেশ শুনতে হবে', হাদীস নং: ৪)*

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: উক্ত হাদীস থেকে এটি সাব্যস্ত হয় যে, যারা জ্ঞানার্জন কিংবা ধর্মের খাতিরে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজেদের কোন অনুসরণীয় ব্যক্তির সেবায় উপস্থিত হতে চায়, তারা নিজেদের সুযোগ-সুবিধামত একটি নির্দিষ্ট দিন ঠিক করতে পারে যে দিন তারা সহজেই কোন সমস্যা ছাড়া উপস্থিত হতে পারে আর এই বিষয়টি বিবেচনা করে (জলসা সালানার জন্য) ২৭ ডিসেম্বর দিনটি নির্ধারণ করা হয়েছে।" *(রূহানীখাযায়েন, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ৬০৮-৬০৯)*

জলসার গুরুত্ব ও মূল লক্ষ্য

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

"বয়আতের বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর সাক্ষাতের বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন- এ ধরনের বয়আত সম্পূর্ণরূপে কল্যাণবিবর্জিত এবং নিছক একটি লোকাচার বলে সাব্যস্ত হবে। আর যেহেতু প্রত্যেকের জন্য প্রকৃতিগত দুর্বলতা বা সামর্থ্যের অভাব কিংবা দূরত্বের কারণে সাহচর্যে এসে অবস্থান করা অথবা বছরে কয়েকবার সাক্ষাতকল্পে কষ্ট করে আগমন করা সহজসাধ্য নয়, কেননা অধিকাংশ মানুষের অন্তরে সেই ভালবাসার টান এখনও সৃষ্টি হয় নি যার ফলে তারা বড় বড় কষ্ট স্বীকার করতে ও বড় বড় ক্ষতি মেনে নিতে পারে, তাই বছরে তিন দিন এমন জলসার জন্য নির্ধারণ করা সমীচীন বলে মনে হয়, যাতে আল্লাহ্ চাইলে সমস্ত নিষ্ঠাবান সদস্য দৈহিক সুস্থতা ও সুযোগ-সুবিধা সাপেক্ষে আর বড় ধরনের কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে নির্ধারিত তারিখে এসে উপস্থিত হতে পারেন। ... যতদূর সম্ভব সব বন্ধুর কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে, আধ্যাত্মিক আলোচনা শোনার উদ্দেশ্যে এবং দোয়ায় অংশ নেয়ার জন্য নির্ধারিত তারিখে চলে আসা উচিত। আর এ জলসায় এমনসব সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সুগভীর জ্ঞানের কথা শোনানোর আয়োজন থাকবে যা ঈমান, দৃঢ় বিশ্বাস ও ধর্মীয় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য অপরিহার্য। এছাড়া সেসব বন্ধুর জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা হবে এবং তাদের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগও দেয়া হবে আর পরম দয়ালু খোদার দরবারে যথাসাধ্য আকুতি জানানো হবে, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং নিজের জন্য মনোনীত করেন আর তাদের মাঝে যেন পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেন। এছাড়া এসব জলসার আরেকটি বাড়তি লাভ যা হবে তা হল, প্রতি বছর যেসব নতুন নতুন ভাই জামা'তে যোগ দিবেন তারা নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে তাদের পুরনো ভাইদের চেহারা দর্শন করবেন, আর একে অপরের সাথে পরিচিত হয়ে পারস্পরিক ভালবাসা ও হৃদ্যতার বন্ধনে ক্রমাগতভাবে উন্নতিলাভ করবেন। আর যে ভাই এ সময়ের মধ্যে নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যাবেন, এ জলসায় তার জন্য ক্ষমা চেয়ে দোয়া করা হবে। এছাড়া সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আর তাদের স্বভাবগত শুষ্কতা, পারস্পরিক দূরত্ব ও কপটতা দূর করার জন্য মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত খোদা তা'লার দরবারে সদয় মিনতি জানানো হবে। আর এ ঐশী জলসায় আরও অনেক আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও উপকার নিহিত রয়েছে যা ইনশাআল্লাহুল কাদীর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ পেতে থাকবে।" *(রূহানী খাযায়েন, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫১-৩৫২ এবং মজমুআয়ে ইশতিহারাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০২-৩০৩)*

০৬ আগস্ট, ২০২১ যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে
জলসা সালানায় প্রদত্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়: মেহমান ও মেযবানের দায়দায়িত্ব

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ ইনশাআল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা আরম্ভ হচ্ছে। সর্বপ্রথম আমি বলতে চাই, এ দিনগুলোতে অনেক দোয়া করুন যেন জলসা সকল অর্থে কল্যাণজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা এ দিনগুলোতে একান্ত ধর্মীয় পরিবেশ বিরাজমান রাখুন আর অংশগ্রহণকারীদের হৃদয়সমূহকে পুণ্য ও তাকওয়ায় সমৃদ্ধ করুন। যদিও আজকাল যে মহামারি ছড়িয়ে আছে সেকারণে এখানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অনেক সীমিত। কিন্তু আমাকে জানানো হয়েছে যে, ঘরে ঘরে এবং কোন কোন জায়গায় বিভিন্ন মসজিদে বা যেখানে হলের সুবিধা আছে সেখানে হলে জামা'তী ব্যবস্থার অধীনে জলসা শোনা যাবে। যাহোক, যারাই এভাবে জলসায় যোগদান করছেন তারাও এই চিন্তাচেতনার সাথে জলসায় যোগদান করুন, যেন আপনারা জলসাগাহেই উপস্থিত আছেন। আর তিন দিনই অনুষ্ঠানমালা শ্রবণ করুন এবং দোয়ায় অতিবাহিত করুন। এ বছর এভাবে জলসার আয়োজন ব্যবস্থাপনার জন্যও এক নতুন অভিজ্ঞতা আর অংশগ্রহণকারীদের জন্যও। আয়োজকদের হাতে অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা পূর্বে থাকতো সেগুলো এ বছর তাদের হস্তগত হয় নি। তাদের ধারণা ছিল, সেগুলো হস্তগত হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয় নি। তাই অতিথি বা

জলসায় যোগদানকারীরাও এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে যেখানেই আয়োজকদের আয়োজনের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়ে গেছে সেগুলো উপেক্ষা করুন আর দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটান এবং পরবর্তী জলসা স্বীয় অতীত-ঐতিহ্যে আয়োজিত হতে পারে। কারও কারও অভিযোগ রয়েছে যে, কতিপয় শর্তের কারণে আমাদের জলসায় যোগ দিতে দেয়া হয় নি অথবা কোন কোন স্থানে যোগদানকারীদের যে নির্বাচন হয়েছে তা সঠিক হয় নি। যাহোক, আয়োজনকারীরা এই বিষয়ে তাদের কারণ দেখিয়েছে। কতিপয় স্থানীয় জামা'তের ব্যবস্থাপনাও তাদের কারণ দেখিয়েছে। অজুহাত সঠিক হোক বা ভুল, সেটিকে একপাশে রেখে জামা'তের সদস্যদের আমি এটিই বলব যে, এই ক্ষেত্রেও উপেক্ষা করুন আর ধরে নিন যে, এটি যেহেতু প্রথম অভিজ্ঞতা তাই কিছু ভুলত্রুটি হয়ে গেছে। অতএব ক্ষমা করে দিন আর কোন প্রকার কষ্ট মনে স্থান দেবেন না। এরপর আমি জলসা এবং আতিথেয়তার বরাতে কিছু কথা বলব। সাধারণত জলসার দিনের খুতবায় আমি অতিথিদের দায়িত্বের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি অথবা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কিছু কথা বলে থাকি। জলসার এক জুমুআ পূর্বের খুতবায় অতিথিসেবক ও ডিউটি প্রদানকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলে থাকি। কিন্তু এবার যেহেতু পূর্বে দায়িত্ব পালনকারীদের দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু বলি নি তাই আজ উভয়ের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলব।

প্রথমে মেজবান ও দায়িত্বপালনকারীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, পরিস্থিতির কারণে আতিথেয়তায় কোন ঘাটতি থাকা উচিত নয়। বিদেশ থেকে যে ছয়-সাত হাজার অতিথি আসতেন, এবার তারা আসছেন না। দেশের বিভিন্ন শহর থেকে আগত অতিথিরা থাকবেন আর তাদের সংখ্যাও অনেক স্বল্প। তাই এই বিষয়টিকে সহজ মনে করে শৈথিল্য প্রদর্শন করবেন না। যদি কোথাও ঘাটতি থেকে যায় তাহলে যারা কাছের মানুষ হয়ে থাকে, যাদের সাথে সম্পর্ক থাকে, তাদের অভিযোগের মাত্রা বেড়ে যায়। তাই খুবই সচেতনতা ও মনোযোগের সাথে সবার আতিথেয়তা করুন। কোন প্রকার ঘাটতি যেন না থাকে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যুক্তরাজ্য জলসার কর্মীদের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, যেমনটি আমি গতকাল কর্মীদের (কাজের প্রস্তুতি) পরিদর্শনের সময় বলেছিলাম যে, নাসেরাত, লাজনা, আতফাল, খোদ্দাম ও আনসারের মধ্য থেকে সকল স্তরের কর্মী, নিজেদের দায়িত্ব এবং কাজের ক্ষেত্রে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছে আর বড় আয়োজন সামলানোর যোগ্যতাও রাখে। নতুন অংশগ্রহণকারী ছেলে ও মেয়েদের ভালভাবে তারা কাজ শেখাতে পারে। তাই এদিক থেকে কোন চিন্তা নেই যে, তারা কাজ জানে না। জলসার প্রতিটি বিভাগে দক্ষতার সাথে কাজ করার লোক রয়েছে এবং তারা কাজ করতে পারে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তা'লারও নির্দেশ রয়েছে যে, মু'মিনকে স্মরণ করাতে থাকা উচিত, এটি তার জন্য উপকারী। আর যেমনটি আমি বলেছি, জলসার আয়োজন সীমিত পরিসরে করা হয়েছে। কখনও কখনও প্রয়োজনাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বিপদজনক তথা স্বল্প সংখ্যক মানুষের জন্য জলসা হচ্ছে, এটি আমরা সহজেই সামাল দিতে পারব। কতিপয় ক্ষেত্রে অসাবধানতার কারণে ঘাটতি থেকে যায়, ত্রুটি দেখা দেয় আর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যারা নতুন তারা এর ভুল অর্থও গ্রহণ করতে পারে। অতএব, অতিথিদের সেবাযত্ন এবং নবাগতদের শেখানোর জন্যও এটি আবশ্যক যে, আয়োজন ততটা বড় না হলেও প্রতিটি বিভাগের প্রতিটি কাজই গুরুত্বপূর্ণ। আর বিশেষকরে আজকাল আবহাওয়াও বেশ প্রতিকূল। এর কারণেও কোন কোন বিভাগের অনেক বেশি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক কর্তব্যরত ব্যক্তির একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, অতিথি কম হোক বা বেশি, জলসায় আগমনকারী অতিথিরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথি। তাই আমাদের উচিত তাদের যথাসাধ্য সেবা করা। নবী-রসূল এবং তাঁদের জামা'তের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অতএব, ধর্মীয় জামা'ত হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জন্য আবশ্যক হল, আমাদের আতিথেয়তা যেন বিশেষ মানের হয় আর এই বৈশিষ্ট্য যেন আরও উজ্জ্বল হয়। মহানবী (সা.)-এর যুগে যখন আগত অতিথির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তিনি (সা.) সাহাবীদের মাঝে অতিথিদের বণ্টন করে দিতেন। সাহাবীরা পরম আনন্দে অতিথিদের নিজেদের সাথে নিয়ে যেতেন। প্রভাতে যখন তিনি (সা.) অতিথিদের কাছে তাদের রাত্রিযাপন এবং সাহাবীদের আতিথেয়তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, তাদের অবস্থা জানতে চাইতেন, সেবার মান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, তখন প্রত্যেকের উত্তর এটিই হত যে, আমরা এমন অতিথিসেবক পূর্বে দেখি নি যারা এত উন্নত মানের আতিথেয়তা করে। অতএব, এটি হল সেই আদর্শ যা মহানবী (সা.)-এর তরবীয়তের কল্যাণে সাহাবীরা আমাদের সামনে এবং আমাদের জন্য স্থাপন করেছেন। আর এ যুগে, যখন কিনা আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করেছি, তিনি (আ.)ও আমাদেরকে সেই আদর্শ অনুসরণের উপদেশ দিয়েছেন, যার দৃষ্টান্ত সাহাবীরা স্থাপন করেছিলেন।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ (জামা'তের) লোকদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: আমার নীতি অনুযায়ী যদি কোন অতিথি আসে আর গালমন্দ পর্যন্তও বিষয় গড়ায়, অর্থাৎ অতিথি যদি কটু ভাষা ব্যবহার করে এবং কঠোর আচরণ করে, তাদের ব্যবহার ভাল না হয়, তবুও তা সহ্য কর।

যদিও তিনি এখানে অ-আহ্‌মদী অতিথিদের বিষয়ে এই নসীহত করেছিলেন, কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, অতিথি যে-ই হোক না কেন, আহ্‌মদী অতিথি হলেও একজন মেজবানের কাজ হল, উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করা এবং কঠোরতার উত্তর কঠোরতার মাধ্যমে না দেয়া। আপন-পর সবার ক্ষেত্রে আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আতিথেয়তার অসাধারণ মান দেখতে পাই। আপনজনদের সাথেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অসাধারণ আতিথেয়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর কেনই বা হবে না, এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এরই সেই উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করার ছিল যার মাধ্যমে ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর চিত্র আমাদের সম্মুখে আসার কথা যেন আমরা তা জগতের সামনে উপস্থাপন করতে পারি।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একদা আমি লাহোর থেকে কাদিয়ান আসি। হযরত সাহেব আমাকে মসজিদ মোবারকে বসান, যা তখন পর্যন্ত ছোট একটি জায়গা ছিল। এখনও তা ছোট মসজিদ, কিন্তু তখন খুবই ছোট ছিল, একটি কক্ষের সমান হবে। এরপর [তিনি (আ.)] বলেন, আপনি বসুন, আমি আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসছি। একথা বলে তিনি (আ.) ভেতরে যান। মুফতী সাহেব (রা.) বলেন, আমার ধারণা ছিল, হয়ত কোন সেবকের হাতে খাবার পাঠিয়ে দিবেন, কিন্তু কয়েক মিনিট পরে যখন জানালা খুললো তখন আমি দেখি, তিনি নিজের হাতে থালায় করে আমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছেন। আমাকে দেখে বলেন, আপনি খাবার খান আমি পানি নিয়ে আসছি। মুফতী সাহেব (রা.) বলেন, আবেগের আতিশয্যে আমার (চোখ থেকে) অশ্রু নির্গত হয় যে, আমাদের ইমাম ও নেতা যেখানে আমাদের এমন সেবা করেন সেক্ষেত্রে আমাদের পরস্পরের কীরূপ সেবা করা উচিত!

একবার বিছানাপত্রের স্বল্পতা দেখা দিলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের বিছানাও অতিথিদের দিয়ে দেন, বরং বাড়ির সমস্ত বিছানাপত্র দিয়ে দেন আর নিজে বিছানা ছাড়াই সারারাত কষ্টের মাঝে কাটিয়ে দেন, কিন্তু কাউকে বুঝতেও দেন নি যে, আমার কষ্ট হয়েছে। এটি হল, অতিথিসেবার জন্য সত্যিকার ত্যাগ বা কুরবানী। কতিপয় লোক কোন কোন সময় ত্যাগস্বীকার করে ঠিকই, কিন্তু আবার খোঁটাও দেয় যে, এই কুরবানী বা ত্যাগের কারণে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমার সর্বদা এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি থাকে যে কোন অতিথির যেন কোন কষ্ট না হয়। বরং এজন্য সর্বদা তাগিদ দিতে থাকি যে, যতদূর সম্ভব অতিথির আরামের ব্যবস্থা করা উচিত। [তিনি (আ.)] বলেন, অতিথির হৃদয় কাঁচের মতো নাজুক বা স্পর্শকাতর হয়ে থাকে এবং সামান্য আঘাতেই তা ভেঙে যায়। তিনি (আ.) বলেন, ইতিপূর্বে আমি এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম যে, (আমি) নিজেও অতিথিদের সাথে বসে আহার করতাম (আর) বুঝতে পারতাম যে, অতিথিসেবা কেমন হচ্ছে। (খাবার) কতটুকু আছে, যথেষ্ট আছে কিনা, সবাই পেয়েছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি? [তিনি (আ.)] বলেন, কিন্তু অসুস্থতার কারণে যখন থেকে আমাকে বেছে খেতে হচ্ছে বা পরহেযী খাবার খেতে হচ্ছে তখন থেকে আর পূর্বাবস্থা বলবৎ থাকে নি, পাশাপাশি আরও একটি কারণ দেখা দেয় আর তা হল, অতিথির সংখ্যা এতটাই বেড়ে যায় যে, স্থান সংকুলান হত না। এক জায়গায় বসে সবার আহার করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় খাবার পরিবেশন করা হয়ে থাকবে অথবা হয়ত পালা করে (খাবার) পরিবেশন করা হত, তাই অপারগ হয়ে পৃথক হতে হয়েছে।

একবার যখন অনেক অতিথি আসে তখন তিনি (আ.) লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপককে বলেন, দেখ! অনেক অতিথি এসেছে, তাদের মধ্যে কতককে তুমি চেন আর কতককে (চেন) না; তাই তোমার উচিত হবে সবাইকে সম্মানিত জ্ঞান করে সেবা করা। কাজেই, অতিথিসেবকের কাছে সকল অতিথি সমান। কারও সাথে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবহার করবে না। এমন নয় যে, অমুক ব্যক্তি কর্মকর্তা অথবা অমুক আমার পরিচিত, তাই তার বেশি সেবা করব এবং তার সাথে বেশি ভাল ব্যবহার করব। সবাইকে অতিথি জ্ঞান করে সমান সেবা করবে। প্রত্যেক অতিথির সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ ও সম্মানজনক ব্যবহার করা উচিত, এটিই অতিথিসেবার মূল দাবি। তিনি (আ.) তাকে বলেন: তোমার প্রতি আমার সুধারণা রয়েছে যে, তুমি অতিথিদের যত্নআত্তি করে থাক, তাদের সবার প্রাণঢালা সেবাযত্ন কর। অতএব, এটি হল সেই সুধারণা, যা আজও সকল সেবকের ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেবকদের অধিকাংশই এই সুধারণার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হন। যাদের মাঝে কোন দুর্বলতা রয়েছে তারা স্বয়ং নিজেদের যাচাই করুন আর দেখুন যে, কীভাবে তারা নিজেদের দুর্বলতা দূর করে অতিথিসেবার মান উন্নত করতে পারেন। আমি জানি, কোন কোন বিভাগের কর্মীদের অতিথির পক্ষ থেকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু কখনও উন্নত ব্যবহার পরিত্যাগ না করা আমাদের দায়িত্ব। অতিথি যা ইচ্ছা বলুক, প্রত্যেক কর্মীকে নিজের জন্য এটি আবশ্যক করে নিতে হবে যে, সে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করবে। এবার হয়তো সংখ্যা সীমিত

হওয়ার কারণে কর্মীদের তেমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না বা কর্মীদের ধারণা থাকবে যে, সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। কিন্তু কর্মীরা যখন বিভিন্ন বিধিনিষেধের প্রতি অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তখন হতে পারে, কোন কোন অতিথি সেটি পছন্দ করবেন না। যেমন, কর্মীরা যখন দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যে, মাস্ক পরে থাকতে হবে, দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। সাধারণত আমরা এগুলো মেনে চলি না। খাবার খাওয়ার সময় বিভিন্ন নিয়ম মেনে চলতে হবে। কিন্তু সব কথা শোনার পরও কেউ যদি রূঢ় আচরণ করে এবং নির্দেশিত বিষয়াদির প্রতি মনোযোগ না দেয় তাহলে মানুষের কথা শুনেও ভালবাসার সাথেই অতিথিকে বুঝাবেন। সাধারণত অতিথিরাও বুঝেন যে, তাদেরকে বিভিন্ন নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে, কিন্তু কিছু মানুষ স্বভাবগতভাবেই কোন কোন বিষয়ে চটজলদি অসন্তুষ্ট হয়ে যান, আর এমন সমস্যা সৃষ্টিকারী লোকের সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকজনই হয়ে থাকে; আর অপরদিকে কর্মীদের ব্যবহারও যদি কঠোর হয় তাহলে চরম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই যদি কাউকে বুঝাতেও হয়, কোন অনুরোধও যদি করতে হয়, কোন কথা বলতে হয়, তাহলে পরম ধৈর্য ও বিনয়ের সাথে বুঝান। মহানবী (সা.) একজন মু'মিনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন যে, সে অতিথির সম্মান করে। অর্থাৎ মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হল, সে অতিথির সম্মান করে। অতএব, এই মু'মিনসুলভ বৈশিষ্ট্য সবার মাঝে সৃষ্টি হওয়া উচিত। বৃষ্টির কারণে হাদীকাতুল মাহ্‌দীর পার্কিং-এ সীমিতসংখ্যক গাড়ি পার্ক করার ব্যবস্থা থাকবে। প্রশস্ত মাঠ থাকলেও বৃষ্টির কারণে তা ভেজা, তাই সেখানে গাড়ি পিছলে যাওয়ার বা কাঁদায় আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে অন্যত্র পার্কিংয়ের জায়গা নেয়া হয়েছে এবং সেখান থেকে বাসে করে অতিথিদের নিয়ে আসা হবে। এখানে গাড়িতে করে যারা আসবেন তাদেরকে কর্তব্যরতদের অত্যন্ত সম্রতা ও ভালবাসার সাথে বুঝাতে হবে। অনেকে সরাসরি (হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে) চলে আসেন এবং পীড়াপীড়ি করেন যে, আমরা এসে গেছি তাই আমাদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হোক। পরম ভালবাসার সাথে তাদেরকে বুঝান আর অতিথিদেরও কর্তব্যরতদের কথা বুঝতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই কাজে সহজসাধ্যতা ও গতি সঞ্চার হতে পারে।

অতএব, উভয়পক্ষীয় সহযোগিতার হাত প্রসারিত থাকা উচিত। কেবল অতিথিরাই অতিথিসেবকদের কাছে এই প্রত্যাশা রাখবেন না যে, এরাই আমাদের সেবায় নিয়োজিত, তাই আমাদের সমস্ত কথা শুনতে হবে এবং মানতে হবে। বরং যে নিয়মকানুন নির্ধারণ করা হয়েছে, অতিথিদেরও তা মেনে চলা উচিত। তবেই (সকল) কাজ যথাযথভাবে এবং দ্রুততার সাথে হতে পারে। অতিথিরা এ বিষয়টিও সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, ইসলাম মেজবানকে যেখানে অতিথির সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে অতিথিদেরও এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে, অতিথি হিসেবে তোমাদেরও কিছু দায়দায়িত্ব রয়েছে। ইসলাম সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, অতিথি হিসেবে তোমরা যখন কারও কাছে যাবে তখন মেজবানের ব্যস্ততার প্রতিও খেয়াল রাখবে। আর সে আমন্ত্রণ জানালে যেও বা তাকে আগাম জানিয়ে যেও। একদিকে মেজবানকে নির্দেশ দিয়েছে যে, বাড়িতে আগত অতিথির সাথে তুমি সদাচরণ করবে, তা সে যখনই আসুক না কেন। অপরদিকে অতিথিকে বলেছে, কারও বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে আগাম জানিয়ে যাবে। যদি না জানিয়ে যাও আর গৃহবাসী তোমাকে ভেতরে আসতে বারণ করে তাহলে কোন অভিযোগ না করে ফিরে যেও। জলসায় (আগত) অতিথিদের ক্ষেত্রে সাধারণত এ বিষয়টি প্রযোজ্য হয় না, কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, এ বছর বিশেষ পরিস্থিতির কারণে বয়সেরও একটি সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, অর্থাৎ এই বয়স থেকে এই বয়সের লোকেরা জলসায় আসতে পারবে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বয়সের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিষয়ক আরও কিছু বিধিনিষেধ রাখা হয়েছে আর এগুলো দৃষ্টিপটে রেখে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং জামা'তগুলোকে বলা হয়েছে যে, বেছে বেছে ঐ লোকদের পাঠাবেন যারা এসব শর্তে উত্তীর্ণ হয়। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত লোক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এদিক সেদিক হয়ে থাকবে এবং কারও কারও অভিযোগও থেকে থাকবে। এভাবে কতক লোক এ দেশে নতুন এসে থাকবেন আর তাদের ক্ষেত্রে শর্ত পূর্ণ হয় না কিন্তু তাদের দাবি হল, তাদেরকে যেন অবশ্যই জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। বহির্বিশ্ব থেকে আগমনকারী অনেকে হয়তো নিজ আত্মীয়স্বজনের সাথে চলে আসার চেষ্টাও করবে অথবা নিজ এলাকার ব্যবস্থাপনার ওপর চাপ প্রয়োগ করবে যে, জলসায় অংশগ্রহণের জন্য আমাদেরকে পাশ দেয়া হোক। তাদেরকে বলতে চাই, এভাবে নিয়ম ভঙ্গ করার ফলে সমস্যা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা একজন মু'মিনের জন্য এই নীতিগত পথনির্দেশনা দিয়েছেন এবং মৌলিক চারিত্রিক আচরণবিধি বলে দিয়েছে যে, গৃহবাসীদের অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গৃহে প্রবেশ করবে না আর যদি বলা হয় যে, ফেরত চলে যাও তাহলে কোনরূপ অনুযোগ ছাড়াই ফেরত চলে যাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ

(সূরা আন নূর: ২৯)

আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফেরত চলে যাও তাহলে তোমরা ফেরত চলে যেও। তোমাদের জন্য এ বিষয়টি অধিক পবিত্রতা অর্জনের কারণ হয়। জলসায় আগমন করা এবং এতে যোগ দেওয়ার একটি বড় উদ্দেশ্য হল, নিজেদের সংশোধন এবং আত্মশুদ্ধি। জোর করে অংশগ্রহণের পরিবর্তে যে নিয়ম নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, সেটি মেনে চলা অধিক পবিত্রতার কারণ। অতএব, যারা আমাকেও নাছোড়বান্দা হয়ে পত্র লিখেছেন, অথবা ব্যবস্থাপনাকে বলছেন– যে বিধি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, সেগুলো যদি তারা মেনে চলেন তাহলে তা অধিক উত্তম হবে। মন খারাপ করা উচিত নয় অথবা কোন অনুযোগ করাও উচিত নয়। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা অবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক করে দেন যেন কতক লোক নিজ আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জলসায় স্বাধীনভাবে যোগদান করতে পারে আর এমন অবস্থায় অধিক ব্যাকুলতার সাথে দোয়া নির্গত হয় এবং হবেও। কুরআনের নির্দেশাবলীকে কর্মে রূপায়নের ক্ষেত্রে ছিল সাহাবীদের রীতি আশ্চর্যজনক। এক সাহাবী বলেন, আমি বছরের পর বছর লোকদের বাড়িঘরে বিভিন্ন সময় বা অসময়ে কেবল এ উদ্দেশ্যে যেতাম যাতে কেউ আমাকে বলে যে, এই অসময়ে বাড়ীতে প্রবেশ করা নিষেধ, এখন আমরা তোমার সাথে দেখা করতে পারব না, ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারছি না, সাক্ষাত করা সম্ভব নয় ফিরে যাও। তিনি বলেন, আমার বাসনা ছিল, কেউ যদি আমাকে এভাবে বলে তাহলে আমি কুরআনের আদেশ মান্য করে পুণ্যের ভাগী হব। কিন্তু কখনও এমনটি হয় নি যে, আমি কারও বাড়িতে গিয়েছি, আর আমার সামনে কেউ অপারগতা দেখিয়েছে। মোটকথা মেযবান এবং অতিথি উভয় পক্ষ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করতেন। এই সার্বিক চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বন এবং কুরআনের শিক্ষার ওপর আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে আমি বলেছি এবং একটি নীতিগত নির্দেশনা দিয়েছি কিন্তু অনেকে এমনও আছেন যারা নিজেদের কথা মানানোর জন্য বলে দেন বা বলে দিবেন যে, তাহলে ব্যবস্থাপনারও না বলা উচিত নয়। স্বাভাবিক সময়ে ব্যবস্থাপনা নিষেধ করে না আর করা উচিতও নয়। যদি করে তাহলে নিশ্চয় অতিথির প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা হবে না এবং ইসলামী শিক্ষা-পরিপন্থী কাজ করা হবে, যে শিক্ষার ওপর আমল করার প্রতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন এবং স্বীয় আদর্শের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন অর্থাৎ অসময়ে রাতের বেলা অতিথি এসেছে আর তখনও তাদের আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, এবারের জলসা যে পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা একটি বিশেষ অবস্থা, এতে বাধ্য হয়ে অতিথিদের অংশগ্রহণ করতে বারণ করা হচ্ছে। তাই কোন অভিযোগ না করে এটি মেনে নেয়া উচিত। কিন্তু একই সাথে একথাও বলতে চাই যে, যারা আমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন– একান্ত অপারগ না হলে তারা যেন অবশ্যই জলসায় অংশগ্রহণ করেন। অন্যথায় তাদের অংশগ্রহণ না করায় সেসব লোকের অধিকার হরণ হবে যাদেরকে অনুমতিপত্র দেওয়া হয় নি। বৈরী আবহাওয়াকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাবেন না। যেহেতু বিরূপ আবহাওয়ার কথা এসেছে; এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের স্মরণ রাখতে হবে যে, রাবওয়া কিংবা কাদিয়ানে শীতের দিনে উন্মুক্ত মাঠে জলসা হয়। রাবওয়াতে নিষেধাজ্ঞার কারণে এখন জলসা হয় না আর অনেক বছর যাবত হয় না কিন্তু এক সময় হত। শীতকালে যখন জলসা হত তখন বৃষ্টি হলেও কোনভাবে নিজেদের ঢেকে চুপচাপ বসে মানুষ জলসা শুনত। এখানেও যখন ইসলামাবাদে জলসা হত তখন বৃষ্টির কারণে মার্কী থাকা সত্ত্বেও জলসাগাহের অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যেত। নিচে বসার জন্য শুধু ঘাস বিছানো হত। বর্তমান সময়ের ন্যায় রীতিমত কোন মেঝে বানানো হত না, যেভাবে এখন কাঠ বা তক্তা বিছানো হয়। আমি যখন জলসায় অংশগ্রহণ করেছি আমার মনে পড়ে, তখন বৃষ্টির কারণে জলসাগাহের কিছু অংশে পানি ঢুকে গিয়েছিল আর মাটি ভিজে গিয়েছিল। কিনারায় পানি জমে ছিল আর যারা কিনারায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ত তাদের হাঁটু ও কপাল পানি অথবা কাদাতে ভেজা থাকত। আমার সাথেও এমনটিই ঘটেছে। সিজদা থেকে উঠে প্রথমে কপাল পরিষ্কার করতে হত যাতে চোখে পানি বা কাদা ঢুকে না যায় অথবা কপালে ঘাস লেগে থাকত। কিন্তু আমি দেখেছি, সবাই এক ধরনের গভীর অবেগ নিয়ে জলসায় অংশগ্রহণ করত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই আবেগ-অনুভূতি এখনো রয়েছে আর বলা উচিত অধিকাংশ আহ্‌মদীর মাঝেই এমন আবেগ-অনুভূতি বিদ্যমান। কিন্তু কেউ কেউ কিছুটা নাজুক বা স্পর্শকাতরও হয়ে থাকেন অথবা পরিস্থিতির কারণে বা যুগের ব্যবধানের কারণে স্পর্শকাতর হয়ে গিয়ে থাকবেন, তাদের জন্য আমি বলছি– তারা যদি অনুমতিপত্র পেয়ে থাকেন তাহলে তারা যেন অবশ্যই অংশগ্রহণ করেন আর কোন অজুহাত যেন না দেখান। এছাড়া যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, কিছু লোক ঝগড়াটে স্বভাবের হয়ে থাকে, কিছু লোকের অভিযোগ করার অভ্যাস থাকে আর (তারা) ব্যবস্থাপনার সমালোচনাও (এই বলে) করবে যে, এই ব্যবস্থা এভাবে কেন হল না আর এভাবে হওয়া উচিত ছিল

অথবা না আসার অজুহাত দেখিয়ে বলবে, এজন্য আমরা আসি নি। অতএব, যা-ই হোক এসব কথা মনে রাখতে হবে। আজ, কাল ও পরশুদিনের জন্য যারা আমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন অথবা বলা উচিত যারা অনুমতিপত্র পেয়েছেন তারা যেন অবশ্যই অংশগ্রহণ করেন।

কিছু প্রশাসনিক কথাও বলে দিতে চাই। খাবারের তাঁবুতে খাবার নেওয়ার সময় এবং খাবার খাওয়ার সময় দূরত্ব বজায় রাখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা মেনে চলুন। বিভিন্ন স্থানে একথা লিখে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে যে, দূরত্ব বজায় রাখুন। কিন্তু যে নির্দেশনাই ঝুলানো হোক না কেন তা পড়ার অভ্যাস কিছু লোকের থাকে না, তারা এদিকে দৃষ্টি দেয় না। সাধারণত দেখা গেছে কিছু লোক এমনও আছে যারা আজকাল স্বাভাবিক অবস্থায়ও দূরত্ব বজায় রাখার প্রতি খেয়াল রাখে না। তাই খাবার খাওয়ার সময়ও আর খাবার নেওয়ার সময়ও দূরত্ব বজায় রাখার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবেন। খাবার খাওয়ার সময় তো বাধ্য হয়ে মাস্ক খুলতে হয়, কিন্তু খাবার নেওয়ার সময় যখন লাইনে দাঁড়াবেন তখন মাস্ক পরে রাখবেন। অনুরূপভাবে দায়িত্বরত কর্মীরাও এ বিষয়টি নিশ্চিত করুন যে, সর্বদা মাস্ক পরে থাকতে হবে। কর্মীরা যদি মাস্ক পরার ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রদর্শন করে বা দুর্বলতা দেখায় কিংবা বিধিনিষেধের প্রতি যত্নবান না হয় তাহলে অতিথিরাও মান্য করবে না। এজন্য দায়িত্বরত কর্মীরা এবং অতিথিরা এ বিষয়টি নিশ্চিত করুন যে, আপনারা মাস্ক পরছেন– তা হোক পার্কিং-এ বা গোসলখানায় অথবা পথ চলার সময় বা জলসাগাহে কিংবা খাবারের মার্কীতে। জলসাগাহেও মাস্ক পরে বসতে হবে। তবে হ্যাঁ! কর্তৃপক্ষ যদি কখনও মাস্ক খুলে চেহারা দেখাতে বলে তাহলে এক্ষেত্রে সহযোগিতা করুন। অনুরূপভাবে কোন বক্তব্য চলাকালীন সময় যদি ব্যবস্থাপনার অধীনে শ্লোগান দেয়া হয় তাহলে এ বিষয়টিও নিশ্চিত করবেন যে, শ্লোগান দেওয়ার সময় বা এর উত্তর দেওয়ার সময় যেন কারও মাস্ক খুলে না যায়। অনেকে অসচেতনতা প্রদর্শন করেন। এবার এ বিষয়টি একেবারে নতুন তাই অনেক বেশি সচেতনতার সাথে এবং মনোযোগসহ এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। নিজেদের সুরক্ষার জন্য এবং সেই সাথে অন্যদের সুরক্ষার জন্যও নাক ও মুখ উভয়ই ঢাকা আবশ্যক। এছাড়া গেইট দিয়ে ভেতরে প্রবেশের সময় উভয় ধরনের চেকিং হবে। এইমস কার্ডও চেক করা হবে, আর সম্ভবত ভ্যাক্সিনেশন কার্ড এবং অন্যান্য অনুমতিপত্রও চেক করবে। কাজেই, এক্ষেত্রেও যারা চেক করবেন তাদেরকে আশ্বস্ত করবেন এবং এমন কোন ধরনের মনোভাব প্রকাশ করবেন না যে, এত চেকিং আপনার খারাপ লাগছে। এসব সাবধানতামূলক ব্যবস্থা অংশগ্রহণকারীদের উপকারার্থেই গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া আমি আরেকটি কথা বলতে চাই তা হল, অংশগ্রহণকারী কম হওয়ার কারণে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন না। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা কর্মীদেরও এবং অংশগ্রহণকারীদেরও সম্পূর্ণরূপে সচেতন থাকতে হবে যেমনটি পূর্বেও দিকনির্দেশনা পাওয়া যেত এবং নির্দেশনা থাকত। এরপর খাবার সম্পর্কে একথাও বলে দিচ্ছি যে, দুপুরের খাবার ইনশাআল্লাহ্ মার্কীতেই দেওয়া হবে আর সেখানে আমার ঐসব কথা মনে রাখবেন যা আমি বলেছি। কিন্তু ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে রাতের খাবার প্যাকেট করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। আপনারা খাবার নিজেদের ঘরে নিয়ে যেতে পারবেন। তাড়াতাড়ি বিতরণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে কিন্তু যদি কিছুটা সময় লেগেও যায় সেক্ষেত্রে অস্থির হবেন না। একইভাবে জলসা শোনার ব্যাপারেও সার্বিক যে দিকনির্দেশনা প্রতি বছর দেয়া হয়ে থাকে তা পুনারাবৃত্তি করে দিচ্ছি। জলসা শুনুন আর অনেক দিন পর সাক্ষাত হবার কারণে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে এদিক-সেদিক বসে গল্পগুজবে মত্ত হবেন না। আপনারা যেহেতু জলসার জন্য এসেছেন তাই জলসাই শুনুন। এই মহামারির কারণে অনেক এমন লোকও থাকবেন বরং বলা উচিত, অনেক নিকটাত্মীয় ও বন্ধুও এমন থেকে থাকবেন যারা ভিন্ন ভিন্ন শহরে থাকার কারণে দীর্ঘদিন পর একে অপরের সাথে সাক্ষাত করবেন। কারণ, এ সময়ের মধ্যে জামা'তীভাবেও কোন অনুষ্ঠান হয় নি। তাই, এই দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে সাক্ষাত করা যেন তাদেরকে জলসার অনুষ্ঠান শোনা থেকে বঞ্চিত করে না দেয় বা দোয়ার প্রতি যেন অমনোযোগী না করে। যেহেতু জলসায় এসেছেন তাই এথেকে সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভ করুন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জলসার দিনগুলোতে যিকরে ইলাহীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক একটি গূঢ়তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.)বলেন, আমার মনে হল, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, জলসার দিনগুলোতে যিকরে ইলাহী কর অর্থাৎ কোন সমাবেশে বসে থাকলে তাতে যিকরে ইলাহী হওয়া উচিত। আর আল্লাহ্ তা'লা এর যে কল্যাণের কথা বলেছেন তা হল, **'উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম'** অর্থাৎ তোমরা যদি যিকরে ইলাহী কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লা

তোমাদের স্মরণ করতে আরম্ভ করবেন। এখন ভেবে দেখুন! সেই বান্দার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কে হতে পারে যাকে তার প্রভু স্মরণ রাখে অর্থাৎ যার যিকর করেন স্বয়ং খোদা তা'লা?

অতএব, এ দিনগুলোতে যিকরে ইলাহী আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিকে আরও বেশি আকর্ষণ করার মাধ্যম হয়। তাই, এদিনগুলোতে বিশেষভাবে যিকরে ইলাহীর প্রতি গুরুত্ব দিন এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে আহ্‌মদীরা একত্র হয়ে জলসা শুনছেন বা পরিবারের সদস্যদের সাথে বসে জলসা শুনছেন তারাও যিকরে ইলাহীর প্রতি মনোযোগী হোন, যেন আমরা যতবেশি সম্ভব আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি আকর্ষণ করতে পারি। আমরা যেন আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থাকে উন্নততর করতে পারি এবং আল্লাহ্‌র কৃপা আকর্ষণ করে আমরা যেন জাগতিক বিপদাপদ থেকেও সুরক্ষিত থাকতে পারি।

অতএব, জ্ঞানগর্ভ এবং তরবিয়তী বক্তৃতাসমূহ শুনে এবং দোয়ার প্রতি মনোযোগী হয়ে জলসার এই পরিবেশ থেকে পূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করুন। এবার উপস্থিতির সংখ্যা সীমিত হওয়ার কারণে সবার জন্য চেয়ারে বসার ব্যবস্থা রয়েছে ফলে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার সমস্যাও নেই। এমনিতেও জলসার একটি অধিবেশন খুব বেশি দীর্ঘ হয় না। সাধারণত দুই আড়াই বা সর্বোচ্চ তিন ঘণ্টার অধিবেশন হয় তাই যদি মেঝেতেও বসতে হয় তবুও এতটুকু সময়ের জন্য বসা কঠিন কিছু নয়। পরিশেষে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি, তিনি (আ.) বলেন:

সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনুন! আমি আমার জামা'ত এবং স্বয়ং নিজের জন্যও এটিই চাই এবং পছন্দ করি যে, কেবল বক্তৃতাসমূহে উপস্থাপিত বাহ্যিক কথাবার্তাকেই যেন সবকিছু মনে করা না হয় আর সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেন এতেই সীমাবদ্ধ না হয়ে যায় যে, বক্তা কতই না জাদুকরী বক্তব্য প্রদান করছে আর তার শব্দমালা কতইনা উচ্চাঙ্গের। আমি এতে মোটেও সন্তুষ্ট নই। আমি কৃত্রিমভাবে বলছি না বরং আমার স্বভাব ও প্রকৃতির দাবি হল, যে কাজই করা হবে তা যেন খোদার জন্য করা হয় আর যে আলোচনাই হবে তা যেন খোদার খাতিরে করা হয়।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, মুসলমানদের অধঃপতন ও পশ্চাদপৎতার এটিই অন্যতম কারণ, নতুবা এত সম্মেলন, সমাবেশ ও বৈঠক হয় আর তাতে বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও বাগ্মী বক্তারা তাদের বক্তৃতা পাঠ করে, কবিগণ জাতির দুর্দশায় শোকগাঁথা পাঠ করে– তবুও এসবের কোন প্রভাবই পড়ে না কারণ কি? উন্নতির পরিবর্তে জাতি দিন দিন আরও অধঃপাতে যায় কেন? আসল কথা হল, এসব সমাবেশে আগমনকারী ব্যক্তিরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অংশগ্রহণ করে না।

অতএব, প্রথম কথা হল, প্রতিটি বক্তৃতা শুনুন। এটি দেখবেন না যে, বক্তা ভাল কি-না বা (মনে করবেন না যে,) অমুকের বক্তৃতা শুনতে হবে অমুকেরটা শুনব না। জলসায় বসে প্রতিটি বক্তৃতা শোনা উচিত এবং পুরো আন্তরিকতা ও মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। আর এই আন্তরিকতা তখনই অর্জিত হবে যখন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের অধীর আকাঙ্ক্ষা থাকবে। এই ব্যাকুলতা থাকলে, পরে আমাদের অবস্থার সংশোধন করতে পারে, আমাদের বংশধরদেরও শুধরে দিতে পারে এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। এর জন্য আমাদের চেষ্টা-সাধনা করতে থাকা উচিত। আমাদের মধ্য থেকে যারাই এই জলসায় যোগদান করছে বা শুনছে, প্রত্যেকে নিজের মাঝে সত্যিকার নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করবে– আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার এ দোয়াই থাকবে। আর আবহাওয়ার জন্যও দোয়া করুন। এদিনগুলোতে আবহাওয়া যেন আমাদের কোন অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে বরং আল্লাহ্ তা'লা এটি আমাদের অনুকূলে করে দেন, আমীন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

DR. NAZIFA'S Smile Aid
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

০৬ আগস্ট, ২০২১ যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে
জলসা সালানায় প্রদত্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর মুআয়েনাহ্ সেশনে কর্মীদের উদ্দেশ্যে উপদেশবাণী

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বিগত বছর কোভিডের কারণে জলসা অনুষ্ঠিত হয় নি। এবছরও পরিস্থিতি কিছুটা তেমনই কিংবা একটু ভাল কিন্তু প্রশাসনিক বিধিনিষেধ রয়েছে, কোথাও শিথিল করা হয়েছে আবার কোথাও বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। যাহোক, এরই মাঝে স্বল্প পরিসরে হলেও জলসা অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, যাতে মানুষ জলসায় এসে নিজেদের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে এবং উপকৃত হতে পারে। আর একইভাবে যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার প্রেরণা নিজেদের মাঝে লালন করে তারাও তাদের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে

আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে। কর্মীদেরও এমনই আকাঙ্ক্ষা ছিল, যদিও কর্মী এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না– জলসা করা সম্ভব। এ কারণে ব্যবস্থাপনার মাঝে অনেক সময় কিছুটা শিথিলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তাই আমি তাদেরকে বলি, স্বল্প পরিসরে হোক কিংবা বৃহৎ আকারে– জলসা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্ যাতে কর্মীদের তরবিয়ত অব্যাহত থাকে। নীতিগতভাবে সারাবছরই কিছু কিছু কর্মী এনে তাদের তরবিয়ত দেয়া উচিত ছিল। রাবওয়াতে সরকারী বিধিনিষেধের কারণে বহু বছর যাবত জলসা অনুষ্ঠিত হয় না, তারা বিভিন্ন আঙ্গিকে কর্মীদের তরবিয়ত প্রদান করতে থাকে। একটি দীর্ঘ সময় যদি এভাবে কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয় তবে অলসতা দেখা দেয় আবার কাজ ভুলেও যায়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখানকার কর্মীরা যথেষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এক বছরের মধ্যে তো ভুলে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আর এ বছর যেহেতু কিছুটা বিধিনিষেধ রয়েছে তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মীরা হয়তো কিছুটা কষ্টে পড়বেন, আবার অনেকের কাছে এগুলো কোন বিষয়ই না। উপস্থিতি কম হওয়ার কারণে যারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শৌচালয় এবং শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকেন তাদের হয়তো কোন সমস্যা হবে না কিন্তু আবহাওয়া এমন বিরূপ হয়ে গেছে যে, সেটি তাদের কাজ কমাতে দিবে না।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে, বিশেষকরে গোসলখানা এবং প্রক্ষালনে। একইভাবে ট্রাফিকের কাজ যারা করেন তাদেরও হয়তো এবার এত ভীড় সামলাতে হবে না কিন্তু আবহাওয়া এবং কিছু সুযোগ-সুবিধার অভাব থাকায় মানুষের কাছ থেকে কিছু কটুকথা শুনতে হতে পারে। সেখানেও ধৈর্যধারণ করতে হবে। খাবারের স্থানেও শৃঙ্খলার সাথে খাওয়াতে হবে। নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। এমনভাবে খাবার দিবেন যেন মানুষ নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে খাবার নেয়, কেননা পূর্বে তো মানুষ ভীড় করে খাবার নিত, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে খাবার নিত এবং একসাথে বসে খেত। কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী দূরত্ব বজায় রাখতে হবে আর যারা ডিউটি দিবেন তাদেরকে এটি অত্যন্ত ভালবাসার সাথে বুঝিয়ে করাতে হবে যেন কোন অতিথি অসন্তুষ্ট না হয়। এছাড়া অন্যান্য যেসব বিষয় রয়েছে, যেমন– রুটি প্লান্ট কিংবা খাবার বিষয়াদি; সেক্ষেত্রে বলা যায়, আমাদের কর্মীরা এখন আল্লাহ্‌র ফযলে এতটাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফলে স্বল্প পরিসরে হোক কিংবা লক্ষ লক্ষ মানুষের জলসা হোক– তারা তা সামলাতে পারবে। আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু আপনাদেরকে জলসায় আগত অতিথিদের সেবা করার এবং এক বছরে তরবিয়তের যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে তা পূরণ করার বা কাটিয়ে ওঠার এবং আরও দৃঢ় করার সৌভাগ্য দিয়েছেন, তাই এই দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে নিজ দায়িত্ব উত্তমরূপে পালন করার তৌফিক দান করুন। এছাড়া যে কথা আমি সবসময়ই বলে থাকি এবং যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হল, এ দিনগুলোতে দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। সময়মত নামায আদায় করার প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে সর্বোত্তম সেবা প্রদানের সামর্থ্য দান করুন, আমীন।

ভাবানুবাদ: পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' ডেস্ক

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহ্‌মদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহকচাঁদা বাকি পড়েছে। তাই অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহকচাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহ্‌মদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: **ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।**

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহকচাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন।

ওয়াসসালাম।

খাকসার

সেক্রেটারী ইশায়াত

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

০৬ আগস্ট, ২০২১ যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে
জলসা সালানায় প্রদত্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর উদ্বোধনী বক্তৃতা

বিষয়: তাকওয়া, পরহেযগারী, কোমল হৃদয় ও ভ্রাতৃত্ববোধ

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায় জলসা সালানার উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্ তা'লার সাথে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি করা আর নিজ আত্মশুদ্ধির জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী শ্রবণ করা এবং তদনুযায়ী আমল করা। মোটকথা নিজেদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণের জন্য আমরা এ দিনগুলোতে একত্রিত হই। অতএব এই উদ্দেশ্য সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। যেভাবে আমি খুতবাতেও বলেছিলাম, এ বছরের জলসা বিশেষ অবস্থার কারণে কিছুটা সীমাবদ্ধ। আর এই জলসা এক বছর বিরতি দিয়ে পুনরায় শুরু হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এই মহামারীকে দ্রুত শেষ করে আমাদের প্রতি দয়া করুন। পুনরায় পূর্বের অবস্থা ফিরে আসুক যেন জলসা পূর্ণ জাঁকজমকের সাথে অনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু জলসার প্রকৃত শানশওকত তখন সৃষ্টি হবে যখন জলসায় অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের অবস্থার মাঝে এক পবিত্র পরিবর্তন সাধন করার দিকে মনোযোগী হবে এবং সর্বদার জন্য তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। পূর্বে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণের জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। একবার পানি পান করে নিলাম, আর পান করার প্রয়োজন নেই– বিষয়টি এমন নয়। জলসার দ্বারা তখনই উপকার লাভ হবে যখন এ দিনগুলোতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কথা শুনে নিজেদের পিপাসা নিবারণ করবেন, অতঃপর এই পানি নিজেদের সাথে নিয়ে যাবেন এবং

সারাবছর এর দ্বারা পিপাসা নিবারণ করে নিজেদের জীবনের জন্য পাথেয় সৃষ্টি করতে থাকবেন। তিন দিনের জলসার পরিবেশে অবস্থান করে তথা এ দিনগুলোতে নিজেদের অবস্থার মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টি করে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবেন না। এবার অনেক জামা'ত নিজেদের পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী জলসা শোনার সামগ্রিক ব্যবস্থা করেছে যেগুলো আমরাটিভি স্ক্রিনেও দেখতে পাচ্ছি। এ-ও এক নতুন অভিজ্ঞতা এবং জামা'তে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হল আর নতুন ইতিহাস রচিত হল। জলসা শোনার জন্য বিভিন্ন দেশে লোকেরা বসে আছেন, নিজেদের মজলিসে বসে এই জলসায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। এছাড়া নিজেদের মসজিদগুলোতে এবং নিজেদের হলগুলোতে একত্রে বসে এই জলসায় শামিল হচ্ছেন। নিজ নিজ জামা'তে তারা বসে আছেন এবং জলসা থেকে সরাসরি আমাদেরকে তারা দেখছেন আর আমরাও তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি। এটিও আল্লাহ্ তা'লার কৃপার মাঝে এক বিশেষ কৃপা। বিরূপ পরিস্থিতি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা কতক নতুন জিনিস আমাদেরকে দান করছেন, যা থেকে জামা'ত যথাসাধ্য উপকৃত হচ্ছে। মোটকথা জামা'তগুলো নিজ নিজ দেশে এই জলসার অনুষ্ঠান দেখছে ও শুনছে। অনেকে নিজেদের ঘরে বসে জলসার অনুষ্ঠান দেখছেন। তাই এই জলসার প্রভাব প্রত্যেক শ্রোতার ওপর পড়া উচিত। এমন প্রভাব হওয়া উচিত যা সারা জীবনের পাথেয় হবে। তখনই আমরা বলতে পারব যে, আমরা জলসার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছি এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছি। এর ফলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া থেকে আমরা অংশলাভ করতে পারব। তাই যদি না হয় তাহলে আমরা সেসকল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থেকে যাব যেগুলো জলসার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ যুগে আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার বিরাট এক অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন– যিনি আমাদেরকে সেই পথ দেখিয়েছেন যা আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) প্রদর্শিত বিধিবিধানের পথ। যেগুলোর ওপর আমল করলে আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যলাভ করতে সক্ষম হব এবং মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত উম্মত হয়ে তাঁর (সা.) দোয়ার ভাগিদার হতে পারব। অতএব এ দিনগুলোতে আমাদের প্রত্যেকের এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত, হোক তা এখানে জলসাগাহে উপস্থিত থেকে জলসা শুনে অথবা জামা'তের সার্বিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে জলসা শুনে কিংবা ঘরে বসে জলসা শুনে। জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হবার উদ্দেশ্য নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখুন, যেগুলো বিভিন্ন সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং যার সারাংশ হল, তাকওয়ার ওপর চলা।

তিনি (আ.) বলেন, 'যোহদ' সৃষ্টি কর, 'যোহদ' কীভাবে সৃষ্টি হবে? তাকওয়া বৈ তা সম্ভব নয়। 'যোহদ' শব্দের অর্থ হল, নিজের আবেগকে কুরবানী করা এবং প্রত্যেক প্রকারের মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকা। আর কেবল বিরত থাকাই নয় বরং মন্দের বিরুদ্ধে গিয়ে তা দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করা। জাগতিক অন্যায় আকাঙ্ক্ষা থেকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিরত থাকা। আর নিজেদের সমস্যা খোদা তা'লার ওপর ন্যস্ত করে কেবলমাত্র তাঁর সম্মুখে বিনত হওয়া। এ বিষয়গুলো এমন ব্যক্তির মাঝে সৃষ্টি হতে পারে, যার মাঝে তাকওয়া আছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একবাক্যে আমাদেরকে যে উপদেশ দিয়ে দিয়েছেন, তদনুযায়ী যদি আমরা আমল করি, তাহলে আমাদের জীবনে আমরা এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হব। জগত থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে– এমন নয় বরং মহানবী (সা.) বলেছেন, জাগতিক কাজকর্ম পরিত্যাগ করে জঙ্গলে গিয়ে বসবাস করা ঠিক নয়। নিজেদের সহায়-সম্পদ অপচয় করা এবং সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করা– এটিও ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। নিজেদের পরিবার-পরিজনের অধিকার প্রদান না করা– এটিও ইসলামে বারণ করা হয়েছে। 'যোহদ'-এর অর্থ হল, পৃথিবীতে অবস্থান করে জাগতিক সব কাজ করার পাশাপাশি খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিজের আবেগ-অনুভূতির কুরবানী করা। কোন জাগতিক আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেন অন্তরায় না হয়। আল্লাহ্ তা'লা যদি সম্মান, মর্যাদা এবং সম্পদ দিয়েই থাকেন তাহলে তা যেন আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর বান্দার অধিকার প্রদানের খাতে ব্যয় হয়।

এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের মাঝে থেকেও নিজ ধর্মকে প্রাধান্য দিবে। প্রকৃত মু'মিনের এটিই চিহ্ন। জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য থাকলেও তা যেন মূল উদ্দেশ্য না হয়। তিনি (আ.) বলেন, সাহাবীরাও লক্ষ লক্ষ বরং কোটি কোটি টাকার ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অধিকার এবং বান্দার অধিকার এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যেতেন না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাযকেরাতুল আউলিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, একদা এক ব্যক্তি হাজার হাজার টাকার লেনদেনে ব্যস্ত ছিল। আল্লাহ্‌র এক ওলী তা দেখতে পেলেন এবং সেই বক্তির ওপর কাশফি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তিনি অনুভব করলেন, আর্থিক লেনদেন সত্ত্বেও সেই ব্যবসায়ীর হৃদয় আল্লাহ্ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও অমনোযোগী নয়। তিনি (আ.) বলেন, এমন ব্যক্তির বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ কোন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়বিক্রয়ও তাদের আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে ভুলিয়ে রাখে না *(সূরা আন্ নূর: ৩৮)*। আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই যে, জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা সত্ত্বেও সে খোদা তা'লাকে ভুলবে না। *(আল বদর, ষষ্ঠ খণ্ড, নং: ১১, ১৪ মার্চ-১৯০৭)*

তিনি (আ.) বলেন, সেই ফকির যে জাগতিক কাজকর্মের ভয়ে কোন এক কোণে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকে– সে

নিজ দুর্বলতা প্রকাশ করে। ইসলামে বৈরাগ্যের কোন স্থান নেই। আমরা একথা কখনও বলি না যে, স্ত্রী-সন্তান এবং জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ কর বরং চাকুরিজীবী যেন তাদের দায়িত্ব পালন করে আর ব্যবসায়ী যেন ব্যবসার দিকে পূর্ণ মনোযোগী থাকে; তবে শর্ত হল, ধর্মকে প্রাধান্য দিবে। এই হল প্রকৃত 'যোহদ'। আমরা কি এই 'যোহদ'-এর মান লাভ করতে সচেষ্ট? আর এ বিষয়গুলো তখন সৃষ্টি হবে যখন হৃদয়ে তাকওয়া থাকবে, যখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বৃথা কাজ থেকে বিরত থাকব, যখন আমরা অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করব আর কেবল অনৈতিক কাজ থেকে বিরতই থাকব না বরং উন্নত চারিত্রিক মান প্রদর্শনকারী হব, বাজে কথা প্রচারের বদলে উত্তম কথা প্রচার করব। আমাদের সম্পদ আমাদের নিজেদের এবং আমাদের ভাইদের মাঝে যেন দূরত্ব সৃষ্টিকারী না হয় বরং ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিকারী যেন হয়। অতএব এ দিক দিয়ে আত্মযাচাই করা আবশ্যক তথা আমাদের মাঝে এমন 'যোহদ' সৃষ্টি হোক যেন আমরা আমাদের জাগতিকতাকে ধর্ম বানিয়ে নিই আর খোদা তা'লার সন্তুষ্টির মাধ্যম বানিয়ে নিই। আর এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার ভয় এবং তাঁর ভালবাসা ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না। অতএব এরই নাম 'তাকওয়া'।

এরপর তিনি (আ.) জলসায় আগমনকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'জলসায় অংশগ্রহণও তখন কল্যাণকর হবে যখন তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করার দিক থেকে আদর্শস্থানীয় হবে। খোদাভীতি কী? এটি হল আল্লাহ্ তা'লার ভয়। এই অবস্থা মানুষের মাঝে তখন সৃষ্টি হতে পারে যখন মানুষ তাকওয়ার অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হবে আর হৃদয়ে তাকওয়া থাকবে। মানুষ অনেক এমন কাজ করে, অন্যের সাথে এমন ব্যবহার করে, নিজ কর্মের মাধ্যমে অন্যের অধিকার হরণ করে, অথচ সে বুঝতেও পারে না যে, আমি কী করছি। অথবা অনুধাবন করতে পারলেও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যায়। যদি খোদাভীতি থাকে, আল্লাহ্‌র ভয় থাকে, এই বিশ্বাস যদি থাকে যে, আমার প্রতিটি কথা আল্লাহ্ শুনছেন আর আমার সব কাজ দেখছেন এবং অন্যায় কথা ও অন্যায় কাজের শাস্তিও তিনি প্রদান করেন, তবেই মানুষের হৃদয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি হয়। যখনই সে কারও অধিকার হরণ করার চেষ্টা করবে, তখন এ বিষয়টি সম্মুখে চলে আসবে যে, খোদা তা'লা আমাকে আমার অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি প্রদান করতে পারেন, সেক্ষেত্রে এই খোদাভীতি তাকে অন্যের অধিকার হরণ করা থেকে বিরত রাখবে। অতএব এরূপ গভীরভাবে খোদাভীতির বিষয়টি অনুধাবন করা আবশ্যক।

আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সাধারণ খোদাভীতির কথা বলছেন না বরং তিনি বলেছেন, এর মান এত উন্নত হতে হবে যেন তোমরা এক আদর্শে পরিণত হও। এমন আদর্শে পরিণত হবে যেন মানুষ বলে, প্রকৃত খোদাভীত ব্যক্তি যদি দেখতে হয়, যদি কোন সত্যিকার পুণ্যবানকে দেখতে হয়, যে তার প্রতিটি কথা-কাজে খোদা তা'লার ভয় দৃষ্টিপটে রাখে তাহলে এই ব্যক্তিকে দেখ, এই আহ্‌মদীকে দেখ। অতএব আমাদের আত্মযাচাই করা আবশ্যক যে, আমরা কি এই মান অর্জন করার চেষ্টা করছি? এরপর তিনি (আ.) বলেন, 'পরহেযগারী'তেও অগ্রগামী হও। এক্ষেত্রেও তোমাদেরকে এক আদর্শ হতে হবে অর্থাৎ সবধরনের পাপ থেকে বিরত থাকার দিকে মনোযোগী হতে হবে। তিনি বড় বড় পুণ্যের কথাও বলছেন, বড় বড় পাপ এবং ছোট ছোট পাপের বিষয়েও উল্লেখ করছেন, পাশাপাশি ছোট ছোট গুনাহ থেকে বিরত থাকার উপদেশও প্রদান করছেন। তিনি (আ.) বলেন, পরহেযগারী'তেও আদর্শ হও। নিঃসন্দেহে এটি এক মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে তাকওয়ার পথে বিচরণকারী, প্রকৃতপক্ষে যে বয়আতের অধিকার প্রদানকারী, সে ততক্ষণ পর্যন্ত অধিকার প্রদান করতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ না পরহেযগারী'তে আদর্শ হবে। নিজের মাঝে উঁকি দিয়ে দেখুন, কোন্ কোন্ দোষত্রুটি আমার মাঝে রয়েছে। আমি কি সেগুলো দূর করার চেষ্টা করছি? আর কোন্ পুণ্যের ঘাটতি আমার মাঝে রয়েছে? আমি কি সেই ঘাটতি দূর করার চেষ্টা করছি? এরূপ করলে সে আদর্শ হতে সক্ষম হবে। আপনারা যারা জলসায় আগমন করেছেন, আপনারাও এ বিষয়টিতে আত্মপর্যালোচনা করুন, তবেই জলসা থেকে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবেন। এমন গভীরভাবে আত্মপর্যালোচনা করার বিষয়টি বলার পর এক উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর দিকে তিনি (আ.) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আর তা হল, কোমল হৃদয়ের অধিকারী হও। পরহেযগারীর যে অলঙ্কার, তাকওয়ার ওপর চলার যে পথ, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যলাভ করার যে মাধ্যম, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জান্নাতে প্রবেশ করার যে দ্বারসমূহ রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা লাভ করার যেসব মাধ্যম রয়েছে সেগুলোর মাঝে একটি হল, কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া। অন্যের ওপর নিজের রাগ ঝাড়ার পরিবর্তে রাগ নিয়ন্ত্রণ করাও আবশ্যক। অন্যেরা দোষ করলেও হৃদয় নরম করা এবং ক্ষমা করা অনেক বড় একটি গুণ। এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

(সূরা আলে ইমরান: ১৩৫)

অর্থাৎ 'আর যারা নিজেদের ক্রোধ দমন করে এবং মানুষকে মার্জনা করে; আর আল্লাহ্ তা'লা সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।

অতএব যারা এভাবে নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে, তারাই প্রকৃত মু'মিন। যারা মু'মিন নয় তারা এই মানে উপনীত হতেই পারে না। আল্লাহ্‌র ভয়ে যারা ভীত এবং যারা কোমল হৃদয়ের অধিকারী, তারা যেন খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে নিজেদের রাগ সংবরণ করে এবং নিজ ভাইদের ক্ষমা করে। জাগতিক ব্যক্তিদের মাঝে দৈবাৎ এমন দুই-একজন দেখা যায় যারা এ বিষয়গুলো সংরক্ষণ করে, অন্যথায় এমনটি দেখাই যায় না। অতএব আমাদের প্রত্যেকের এই মানে উপনীত হওয়া আবশ্যক। সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে

আমরা বিবাদ আরম্ভ করে দেই এবং প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, এটি তো মু'মিনের চিহ্ন নয়। মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হল, সে যখন উপেক্ষা করবে এবং ক্ষমা করবে, নিজ ক্রোধ দমন করবে, তখন আল্লাহ্ তা'লা এর পুরস্কারস্বরূপ অনেক বেশি অনুগ্রহ করবেন অর্থাৎ যেহেতু তুমি তোমার ভাইয়ের প্রতি অনুগ্রহ করেছ তাই এর পরিবর্তে আমি তোমার প্রতি এই অনুগ্রহ করছি যে, আমি তোমাকে ভালবাসব। অতএব বৈধ রাগ'কেও খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সংবরণ করা এবং অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা আল্লাহ্‌র কাছে এতই পছন্দনীয় যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তাকে ভালবাসি। তবে হ্যাঁ, যেখানে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর সম্মানের বিষয়টি আসে, সেখানে আত্মাভিমান দেখানো উচিত। সামান্য সামান্য বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা এবং প্রতিশোধ নেয়া অন্যায়। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা লাভ করল, তার আর কী প্রয়োজন থাকে? আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়। তখন তার জীবন হয় পুণ্যে ভরপুর। অতএব নিজ ভাইদের ক্ষমা না করা, নিজেদের বিষয়াদীতে অকারণে উস্‌কানি দেয়া, কাযা বোর্ড বা আদালতের শরণাপন্ন হওয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। একজন প্রকৃত মু'মিনের এগুলো পরিহার করে চলা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা অকারণে বলেন নি যে, রাগ সংবরণ কর– এটি অনেক বড় পুণ্য। এ কথা বলার কারণ হল, রাগ সংবরণ করা খুব কঠিন কাজ এবং অনেক বড় পুণ্যও বটে, তবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর চেয়ে বড় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার আদেশ দিচ্ছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত দেখতে চান যে, মন থেকে ক্ষমা কর, সামান্য বিদ্বেষও যেন হৃদয়ে না থাকে, তাহলে এটিই প্রকৃত ক্ষমা হিসেবে গণ্য হবে। আর এটিই কোমল হৃদয় আর এই সেই মর্যাদা যা আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা লাভ করে। অতএব আমরা যদি আমাদের জীবনকে এই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হই, তবেই আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এই জলসার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে সক্ষম হব। এখন প্রত্যেকেই নিজের হৃদয় যাচাই করে দেখতে পারেন। আমরা কি এই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করছি? যদিও বাইরের লোক জামা'তের মাঝে এমন দৃশ্য এবং এমন সম্পর্ক অনেক দেখে থাকে কিন্তু আমাদের তখনই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত যখন আমাদের প্রত্যেকে একে অপরের জন্য এমন নরম হৃদয় এবং ক্ষমার পরম মানে উপনীত হবে। যেখানে পদে পদে অনুগ্রহের অদর্শ দৃষ্টিগোচর হবে। মহানবী (সা.) এ বিষয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাগের এক ঢোক গিলে ফেলা এত বড় পুণ্যের কারণ হয় যা অন্য কিছুতে লাভ হয় না। খোদা তা'লার সন্তুষ্টি দৃষ্টিতে থাকা উচিত। অতএব আমাদের মাঝে তারা কতই সৌভাগ্যবান যারা নিজেদের হৃদয়ের নম্রতাকে এই মানে উপনীত করার চেষ্টা করে। আর এটিই সেই প্রকৃত শিক্ষা যার মাধ্যমে ভালবাসা বিস্তারলাভ করে। আর ঘৃণার প্রাচীর ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে।

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এবং তাঁর শিক্ষাসমূহের ওপর আমল করার মাধ্যমে এই জলসাতে ভালবাসার বিস্তার ঘটানো এবং ঘৃণার প্রাচীর গুড়িয়ে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত আর এর অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, স্মরণ রেখ! বিবেক এবং আবেগের মাঝে শত্রুতা রয়েছে। যখন আবেগ উদ্বেলিত হয় তখন মানুষের বিবেকবুদ্ধি কাজ করে না। আর যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে এবং পুণ্যকর্ম করে দেখায় তাকে একটি জ্যোতি প্রদান করা হয়, যার মাধ্যমে তার চিন্তাভাবনা এবং বিবেকের মধ্যে একটি নূর সৃষ্টি হয়। অতঃপর নূর থেকে নূরের সৃষ্টি হয়। রাগ এবং আবেগের আতিশয্যে মানুষের মনোমস্তিষ্ক অন্ধকারে ছেয়ে যায়। তাই অন্ধকার থেকে অন্ধকারই সৃষ্টি হয়। আর অন্ধকার থেকে ঘোর অন্ধকারের জন্ম নেয়। তারপর একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রেখ! যে ব্যক্তি কঠোর হয় ও রাগান্বিত হয় তার মুখ থেকে কখনও প্রজ্ঞা ও তত্ত্বপূর্ণ কথা বের হতে পারে না। তার হৃদয়কে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা থেকে বঞ্চিত করা হয় যে কিনা তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে হঠাৎ রেগে গিয়ে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে। নোংরা মনোমস্তিষ্ক এবং লাগামহীন কথাবার্তার মাধ্যমে তাকে সূক্ষ্ম চিন্তাধারা থেকে বঞ্চিত করা হয়। পুণ্য ও মারেফতের কথা তার মুখ থেকে বেরই হয় না। সে এসমস্ত বিষয় থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তিনি (আ.) বলেন, রাগ এবং প্রজ্ঞা কখনও একত্রে থাকতে পারে না। যে ক্রোধান্বিত হয়, তার বিবেকবুদ্ধি স্থূল ও তত্ত্বজ্ঞানহীন হয়ে যায়। তাকে কোন ক্ষেত্রে বিজয় ও সাহায্য প্রদান করা হয় না। ক্রোধ অর্ধেক পাগলামীর নামান্তর। মানুষের রাগ চরমে পৌঁছলে সে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যায়। অতএব রাগ কেবল সাময়িক ক্ষতির কারণই হয় না তথা এক পক্ষের রাগ হল আর এতে অপর পক্ষও রেগে গেল এবং একে অপরের ক্ষতিসাধন করল (ব্যস শেষ হয়ে গেল); বরং এমন রাগ পোষণকারী ব্যক্তি প্রজ্ঞা ও তত্ত্বপূর্ণ কথা থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়। নোংরা হৃদয়ের অধিকারী এবং গালিগালাজকারী ব্যক্তিদের মুখ থেকে কখনও পুণ্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বের হতেই পারে না। আর পুণ্য ও প্রজ্ঞার কথা যদি বেরই না হয় তবে সে তাকওয়াশূন্য হয়ে যায়। আর এখানে এই জলসার আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে এমন মানুষ কোন অংশই লাভ করতে পারে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ জামা'তের কোন সদস্যের এমন হওয়া পছন্দ করেন নি, যে-কিনা জলসাতে অংশগ্রহণ করে এই দিনগুলোতে জলসার পরিবেশ নষ্ট করে আর নিজের প্রতিদিনকার পরিবেশ বিনষ্ট করে। অতএব এই সাধারণ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করার মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। অতঃপর হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, পরস্পরের মাঝে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা প্রত্যেক আহ্‌মদীর মাঝে থাকা উচিত। ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ যেন আদর্শস্থানীয় হয়। জলসার উদ্দেশ্যাবলীর মাঝে এটিও একটি উদ্দেশ্য

যা জামা'তের প্রত্যেক সদস্যের মাঝে সৃষ্টি করা উচিত। এটি বুঝতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য কুরআন করীমে উন্নত মানদণ্ড ও দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। আর তা হল, আনসার ও মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্ববন্ধন।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে এটি এভাবে বর্ণনা করেন,

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۭ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

(সূরা আল্ হাশর: ১০)

অর্থ: আর (এ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাদের জন্যও) যারা পূর্ব থেকেই (মদীনায়) বসবাস করত এবং (মুহাজিরদের আসার পূর্বেই) ঈমান (এনেছিল)। তারা তাদের কাছে আশ্রয়প্রার্থী (মুহাজিরদের) ভালবাসে। আর এ (মুহাজিরদের) যা দেয়া হয় এরা নিজেদের অন্তরে এর কোন প্রয়োজনবোধ করে না এবং নিজেরা দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও এরা নিজেদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়। (আসলে) প্রবৃত্তিতে নিহিত কার্পণ্য থেকে যাদের রক্ষা করা হয় তারাই সফল হবে।

অতএব তারা এমন মানুষ ছিলেন যাদের আদর্শের ওপর পরিচালিত হবার জন্য মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন। এমন ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন তাদের মাঝে ছিল যে, নিজেদেরকে কষ্টকর পরিস্থিতিতে ঠেলে দিয়ে হলেও নিজ ভাইদের জন্য কুরবানী করতে প্রস্তুত ছিলেন। বরং তারা এমন ছিলেন যে, নিজেদের ধনসম্পদের একটি অংশ মুহাজির ভাইদের দিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন এমনকি বাস্তবিকভাবে দিয়েছেনও। অনেকে তো এত উচ্চমার্গে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, যাদের একাধিক স্ত্রী ছিল তারা একজনকে তালাক দিয়ে তার মুহাজির ভাইকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। অপরদিকে মুহাজির ভাইয়েরা নিজেদের ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বলেন, তোমরা তোমাদের এসব ধনসম্পদ ও সামগ্রী নিজেদের কাছেই রাখ। আমাদেরকে কেবল সাময়িক সাহায্য কর। এ হল এমন দৃষ্টান্ত যার ফলে ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববন্ধন, প্রেমপ্রীতি আরও দৃঢ় হয়। কোন পক্ষই লোভলালসা প্রদর্শন করে নি এবং ছোট মনের পরিচয় দেয় নি। বর্তমানে তো এমন মানুষও দেখা যায়, যারা আপন ভাইবোনের সম্পত্তিও গ্রাস করার অপচেষ্টা করে থাকে। তারপর আবার এ নিয়ে মামলা-মোকাদ্দমাও হয়ে থাকে। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেই সুন্দর ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এসেছিলেন যার দৃষ্টান্ত আমরা সাহাবীদের জীবনীতে দেখতে পাই। আর তিনি (আ.) বলেন, **'তোমরাও সাহাবীদের মত আদর্শস্থানীয় হও।'** এই সুন্দর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের তরবিয়ত করার উদ্দেশ্যেই তিনি (আ.) এই জলসার আয়োজন করেছিলেন। এই দিনগুলোতে প্রেমপ্রীতির বিস্তার ও কুরবানী করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, তোমরা পরস্পর এমন হয়ে যাও যেন মনে হয় 'এক মায়ের পেটের দুই সহোদর'। অনেক জায়গায় তো দেখা যায়, আপন ভাই হয়েও সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বজায় রাখে না, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপন ভাই তা বজায় রাখে। আর এ সবকিছু অর্থাৎ ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন রচনা করা যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে হয়। একজন মু'মিনের প্রতিটি কাজ যেন খোদা তা'লার খাতিরে হয়। আর তখনই তা তাকওয়া হিসেবে পরিগণিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এমন মানুষ যারা কুরবানী, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনের এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তারাই সফলকাম হয়েছে। খোদা তা'লার দৃষ্টিতে তাদের আমল কবুল হয়ে গেছে। তারা এই পৃথিবীতেও খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভকারী হয়েছে এবং পরকালেও তাঁর সন্তুষ্টির জান্নাত লাভকারী হবে। খোদা তা'লার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস পোষণকারীদের মাঝে এমন কে আছে যে তাঁর সন্তুষ্টির জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইবে না? এমন কোন সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি নেই, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভ করতে চাইবে না। অতএব এটি অর্জন করতে হলে আমাদেরকে এই দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে।

মহানবী (সা.) বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, কোথায় সেসব লোকেরা যারা আমার প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের জন্য পরস্পরকে ভালবাসতো। আজ আমার আশ্রয় ব্যতিত কোন আশ্রয় নেই। তাই আমি তাদেরকে নিজ ছায়াতলে আশ্রয় প্রদান করব। এ কথা আল্লাহ্ তা'লা বলছেন। দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে কত উচ্চমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করছেন! পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপনকারীদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কতই না অনুগ্রহ! আল্লাহ্ তা'লার কতই না অনুগ্রহ এবং কোন্ পদমর্যাদা তিনি প্রদান করছেন! এরপরও যদি আমরা এ সম্পর্কের গুরুত্ব না বুঝি তবে এমন লোকদের জন্য তা দুর্ভাগ্যের কারণ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করাকেও নিজ আগমনের উদ্দেশ্য আখ্যা দিয়েছেন। এই গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে জলসার একটি উদ্দেশ্য হিসেবে তিনি (আ.) এটিকে পরিগণ্য করেছেন। অতএব পরস্পরের মাঝে বিদ্যমান অভিযোগ-অনুযোগ দূর করে ভালবাসা ও প্রেমপ্রীতির পরিবেশ আমাদের সৃষ্টি করা উচিত। আর সেই মু'মিন হোন এবং সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন যা সাহাবীরা করে দেখিয়েছেন। নিজেদের মিথ্যা আত্মাভিমান ও আমিত্বকে পরিত্যাগ করুন। এরপর তিনি (আ.) বলেন, জলসায় আগমনকারীরা নিজেদের মাঝে বিনয় ও নম্রতার অভ্যাস সৃষ্টি করুন। আল্লাহ্ তা'লা বিনয় ও নম্রতা খুবই পছন্দ করেন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এলহাম করে জানিয়েছিলেন,

تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں

অর্থ: তোমার বিনয়াবনত পন্থায় তিনি সন্তুষ্ট।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির পথ যদি সন্ধান করতে হয় তাহলে বিনয়াবনত পন্থা আমাদের খুঁজতে হবে। পবিত্র কুরআনও এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

(সূরা লুকমান: ১৯)

অর্থ: আর (অহঙ্কারবশে) মানুষকে অবজ্ঞা কর না এবং ঔদ্ধত্যের সাথে পৃথিবীতে চলাফেরা কর না। আল্লাহ্ কোন অহঙ্কারী (ও) দাম্ভিককে পছন্দ করেন না।

অতএব তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা পেতে চাও তবে নিজেদের মাঝে বিনয় সৃষ্টি কর। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক পংক্তিতে বলেন,

بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں،
شاید کہ اس سے دخل ہو دار الوصال میں

অর্থ: সবার চেয়ে নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান কর, হতে পারে এর ফলে তোমরা খোদার প্রিয়ভাজনদের দলভুক্ত হবে।

নিজের বড়ত্ব বর্ণনা অথবা গর্বের সাথে ঘাড় কাত করে চলা অথবা অন্যের কাছে নিজের উত্তম হওয়া প্রমাণ করার মাধ্যমে প্রকৃত মর্যাদা অর্জন করা যায় না বরং বিনয় অবলম্বনের মাধ্যমে খোদা তা'লার নৈকট্য লাভ হয়ে থাকে। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, অহঙ্কারের বিভিন্ন ধরন আছে। কখনও চোখের দ্বারা তা প্রকাশ পায়। অনেকে বাঁকাচোখে তাকায় যদ্বারা অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করে থাকে এবং নিজেকে বড় মনে করে। কখনও কথার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, কখনও মাথা দ্বারা আবার কখনও হাত-পা চালনার মাধ্যমেও অহঙ্কার ফুঁটে ওঠে। মোটকথা অহঙ্কারের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। আর এসকল উৎস থেকে একজন মু'মিনের বেঁচে চলা উচিত এবং তার মাঝে এমন কোনকিছুই অবশিষ্ট থাকা উচিত নয় যার ফলে অহঙ্কারের দুর্গন্ধ ছড়ায় আর সে অহঙ্কার প্রকাশকারী হয়। তিনি (আ.) বলেন, অনেক মানুষ নিজেকে খাকসার সম্বোধন করে থাকে আর বলে, আমরা একান্তই অধম। কিন্তু তাদের মাঝেও কোন না কোন প্রকারের অহঙ্কার থাকে। ফলে অহঙ্কারের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দিক থেকে রক্ষা লাভের চেষ্টা করা উচিত। অনেক সময় এই অহঙ্কার ধনসম্পদ থেকে সৃষ্টি হয়। তিনি (আ.) বলেন, অনেক সময় এই অহঙ্কার ধনসম্পদ থেকে সৃষ্টি হয়। ধনী ব্যক্তিরা অন্যদের ভিখারি মনে করে এবং তারা বলে, কে আছে এক্ষেত্রে আমার সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে? অনেক সময় পরিবার ও বংশমর্যাদা নিয়েও মানুষ অহঙ্কার করে। তারা মনে করে, আমার বংশ বড় আর তার বংশ ছোট। আবার অনেক সময় জ্ঞানের কারণে মানুষের মাঝে অহঙ্কার দানা বাধে। কোন ব্যক্তি যদি ভুল কিছু বলে ফেলে তবে সে তৎক্ষণাৎ তা নিয়ে হৈচৈ বাঁধিয়ে বলে, এ ব্যক্তি তো একটি শব্দও ঠিক করে বলতে পারে না। সর্বোপরি বিভিন্ন ধরনের অহঙ্কার হয়ে থাকে। আর এর সবই মানুষকে পুণ্যকাজ থেকে বঞ্চিত করে দেয় এবং অন্যের উপকার সাধনে বাধা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, এই অহঙ্কারের কারণে মানুষ অন্যের উপকার করতেই পারে না, বরং বঞ্চিত থেকে যায়। তিনি (আ.) বলেন, এ সবকিছু থেকে রক্ষা লাভের চেষ্টা করা উচিত। আর এ সবকিছু থেকে রক্ষা পেতে হলে নিজের মাঝে একটি মৃত্যু আনয়ন আবশ্যক। কিন্তু এজন্য জিহাদ করতে হবে। আত্মসংশোধনের লক্ষ্যে নিজের আমিত্বকে প্রশমিত করতে হবে, মেরে ফেলতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই মৃত্যুকে বরণ না করবে, খোদা তা'লার এই আশিস তার প্রতি অবতীর্ণ হবে না। অতএব আল্লাহ্ তা'লার আশিস যদি লাভ করতে হয় তবে আমাদের মধ্য থেকে অহঙ্কারের বীজ উপড়ে ফেলতে হবে। নিজেদের মিথ্যা আভিজাত্য এবং মিথ্যা সম্মানকে মারতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, তোমরা আমার ভালবাসা লাভ করতে পারবে না।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ জামা'তকে বলেন, জলসার অনেক বড় উদ্দেশ্য হল মানুষের মাঝে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা সৃষ্টি করা। আধ্যাত্মিক পরিবেশের মাধ্যমে যেন সততার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। মহানবী (সা.) একস্থানে বলেন, সততা পুণ্যের পথে পরিচালিত করে এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে, আল্লাহ্ তা'লার নিকট সে সিদ্দীক আখ্যায়িত হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা-পাপ, অন্যায় ও অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করে। আর অন্যায়-অশ্লীলতার পরিণাম জাহান্নাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমি মনে করি, সততা অবলম্বনের বিষয়ে কুরআন করীমে যতটা গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তার সিকিভাগও ইঞ্জিলে বিদ্যমান নেই। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন করীমে মিথ্যাকে মূর্তিপূজার সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যেমনটি বলেন,

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

(সূরা আল্ হাজ্জ: ৩১)

অর্থ: অতএব তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা এড়িয়ে চল এবং মিথ্যা বলাও পরিহার কর।

অপর একস্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ

(সূরা আন্ নিসা: ১৩৬)

অর্থ: তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, এমনকি সেই (সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও।

অতএব আমাদের সততার এরূপ মানদণ্ড যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তবে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, আত্মীয়স্বজনদের দ্বন্দ্ব, সামাজিক নানাবিধ বিষয়– সকল সমস্যা কেবল সততার সাথে কাজ করার মাধ্যমেই দূরীভূত হয়ে যাবে। অতএব আমাদের এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী যদি উন্নত চরিত্র গঠন করি এবং মন্দকর্ম থেকে বেঁচে চলি তাহলে একটি পবিত্র সুন্দর ইসলামী পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে পারব। এটিও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সকল পুণ্যের ওপর আমল এবং মন্দকর্ম থেকে পরিত্রাণ তখনই লাভ করা সম্ভব যখন আমরা তাকওয়ার ওপর চলব আর যেমনটি আমি শুরু থেকে বলে আসছি। আর এ কারণেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকওয়ার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, তাকওয়া অবলম্বন কর, কেননা এটিই সবকিছুর মূল।

তাকওয়ার প্রতিটি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পাপ থেকে বেঁচে চলা। কোন বিষয়ে যদি বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ থাকে– তা থেকেও পাশ কাটিয়ে চলার নাম তাকওয়া। তিনি (আ.) বলেন, হৃদয়ের দৃষ্টান্ত একটি বড় নদীর ন্যায় যা থেকে আরও ছোট ছোট শাখা নদী প্রবাহিত হয় যাকে নালা বা খাল বলে। হৃদয় নামক নদী থেকেও নালা প্রবাহিত হয়ে থাকে। শাখা নদীগুলো অর্থাৎ নালা বা খালের পানি যদি নোংরা ও ময়লা-আবর্জনা দিয়ে ভরা থাকে তবে ধরে নেয়া যায় মূল নদীর পানিও নোংরা হবে। অতএব যদি কারও ঠোঁট কিংবা হাত-পায়ের মাঝে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপবিত্র দেখা যায় তাহলে বুঝে নিতে হবে তার হৃদয়ও এমন। মানুষের কর্ম, তার কথা ও তার আচরণের মাধ্যমে প্রককাশ পায়। অনুভূত হয় তার মাঝে তাকওয়া আছে কি নেই। তিনি (আ.) বলেন, তাকওয়ার বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যেমন– হিংসা, স্বার্থপরতা। আর অবৈধ কর্ম থেকে বেঁচে চলা এবং মন্দ চরিত্র পরিহার করার নামও তাকওয়া। যে ব্যক্তি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করে তার শত্রুও বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"ইদফা' বিল্লাতি হিয়া আহসান।"** ভালভাবে খেয়াল কর! এ নির্দেশ আমাদেরকে কীসের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করছে? এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা হল, বিরোধীরা যদি গালমন্দও করে তবে তার প্রতিউত্তর যেন গালমন্দ না হয় বরং এর মাধ্যমে যেন ধৈর্যধারণ করা হয়। এর ফলে, বিরোধীরা তোমাদের উন্নত মর্যাদা দেখে নিজেরাই লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করবে। আর এ শাস্তি সেই শাস্তির চেয়ে উত্তম ও গুরুতর হবে– যা প্রতিশোধ নেবার জন্য মানুষ করে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, এভাবে তো একজন সাধারণ মানুষ হত্যা পর্যন্ত করে ফেলতে পারে কিন্তু মানবতার দাবি কিংবা তাকওয়ার দাবি এটি নয়। উত্তম নৈতিক চরিত্র এমন মণিমুক্তা যার প্রভাব নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর মানুষের ওপরও পড়ে। জনৈক ব্যক্তি কতইনা উত্তম বলেছেন,

لُطف کُن لُطف کہ بیگانہ شُوَد حلقِہ بہ گوش

অর্থাৎ "অনুগ্রহ করলে একজন অপরিচিত ব্যক্তিও তোমার দলভুক্ত হবে।"

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃত যে বিষয়টি চিন্তনীয় তা হল, মানুষের পুণ্য এবং তাকওয়ার প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। সৌভাগ্যের পথ অবলম্বন করা উচিত। কেবল তখনই কিছুটা সৌভাগ্য অর্জন সম্ভব।

لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ

(সূরা আর্ রাদ: ১২)

অর্থ: খোদা তা'লা কখনও কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করে।

অযথা সন্দেহ করা কিংবা কোন বিষয়কে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা উচিত নয়। এটি একেবারেই বাজে কাজ। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হল, মানুষের খোদার প্রতি অবনত হওয়া উচিত, নামায পড়া উচিত, যাকাত দেয়া উচিত, অধিকার খর্ব এবং মন্দকর্ম থেকে দূরে থাকা উচিত এবং অন্যায় কাজ পরিহার করা উচিত। এটি স্পষ্ট প্রমাণিত বিষয় যে, কোন ব্যক্তি যখন অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় তখন তা গোটা দেশের ধ্বংসের কারণ সাব্যস্ত হয়। অতএব মন্দকর্ম পরিহার কর, কেননা তা ধ্বংসের কারণ। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করতে পারি আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী যেন নিজেদের মধ্যে এমন তাকওয়া সৃষ্টি করি যা আমাদেরকে সমস্ত মন্দকর্ম থেকে বাঁচাবে এবং সকল পুণ্যকর্ম সম্পাদন করার সামর্থ দান করবে। এই আধ্যাত্মিক পরিবেশ আমাদের মাঝে অধ্যবসায়, খোদাপ্রেম, পুণ্য, কোমলতা, পরস্পর ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন, নিষ্ঠা, বিনয় ও সততার উন্নত মানদণ্ড সৃষ্টি করে। আমরা যখন ফিরে যাবো কিংবা আমার কথা যে পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে তথা যারা জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে বিভিন্ন জামা'তে বসে জলসা শুনছেন, তাদের সবার মাঝে যেন এই জলসার পরিবেশ একটি বিপ্লব সাধন করে। আর জলসার পরিবেশ থেকে যখন বাইরে বের হবেন তখন যেন আমাদের মাঝে একটি মহাবিপ্লব সাধিত হয় আর জগদ্বাসী তা যেন দেখতে পারে। আর কেবল তখনই আমরা প্রকৃত ইসলামের বাণী পৌঁছানোর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারব। অন্যথায় আমাদের কথা কেবল বুলিসর্বস্বই রয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী বুঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। এখন আমরা দোয়া করব। দোয়ার মাঝে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করুন, যেন তিনি মানবজাতির প্রতি রহম করেন এবং এ সংকট থেকে মুক্তি দেন। আর কোথাও যদি যুদ্ধের আশঙ্কা থাকে তবে তা-ও যেন দূর করেন এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। আর আমাদের জলসাও যেন পূর্বের মত শানশওকতের সাথে আয়োজন করা যেতে পারে। পৃথিবীর সকল দেশে যে মর্যাদার সাথে জলসা হত তা-ও যেন হতে পারে। পাকিস্তানের আহ্‌মদীদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের সমস্ত দুর্দশা দূর করেন এবং পৃথিবীর সকল অত্যাচারিতের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ দান করেন। বর্তমানে যেহেতু আপনারা ঘরেই অবস্থান করছেন তাই এ দিনগুলোতে নামায আদায় এবং তাহাজ্জুদের প্রতি মনোনিবেশ করুন এবং দোয়ার প্রতি মনোযোগী হোন, কেননা দোয়ার মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ পেতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই সামর্থ্য দান করুন। কারাবরণকারীদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে অতি শীঘ্র মুক্তি লাভের উপকরণ সৃষ্টি করেন, আমীন।

ভাবানুবাদ: পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' ডেস্ক

০৭ আগস্ট, ২০২১ যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে জলসা সালানায় প্রদত্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা

বিষয়: **ইসলামে নারীর অধিকার, ইসলামে বিবাহ-শাদী, পারিবারিক অধিকার, নারীদের সাথে, ন্যায়বিচার, নারী-পুরুষের আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা**

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বর্তমান যুগে আলোকিত চিন্তাধারার নামে, বাকস্বাধীনতা বা মতামতের স্বাধীনতার নামে এমন এক ধারণা জন্ম নিচ্ছে যা আলোকিত হওয়ার চাইতে অন্ধকারের দিকেই বেশি নিয়ে যায়। এটি এমন এক অলীক ধারণা যা সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম ও ঠুনকো আর এর মাধ্যমে কি ধরনের উপকার বা ক্ষতি সাধিত হবে তা নিয়ে চিন্তাও করা হয় নি। ইসলামে বাকস্বাধীনতার নামে যা চলছে এতে লাভের চাইতে ক্ষতি বেশি– এ দিকেও আমাদের লক্ষ্য নেই। আমাদের আগামী প্রজন্মকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে আমরা নিজেরাও এই গর্তে আপতিত হচ্ছি আর আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকেও এতে ঠেলে দেয়ার অপচেষ্টা করছি– এ বিষয়েও আমরা উদাসীন। এই নামসর্বস্ব স্বাধীনতা সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে বর্তমানে এতটাই ছড়ানো হচ্ছে এবং ভুল বিষয় উপস্থাপন করা হচ্ছে যে, এর ফলে আমরা কোন্ ধ্বংসকে আহ্বান জানাচ্ছি তা চিন্তা করার সামর্থ্য লোপ পাচ্ছে। মোটকথা জাগতিক ব্যক্তি যখন জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে যার সাধারণত নেক নিয়্যত কমই থাকে সে এক ধরনের মন্দকর্ম থেকে বাঁচতে গিয়ে অন্য মন্দকর্ম করে বসে, কেননা তার আধ্যাত্মিক চোখ বন্ধ থাকে। আর বর্তমানে জাগতিক কাজকর্ম আর ধর্ম থেকে দূরে সরার কারণে মানুষ ধর্ম থেকে এমনভাবে বিমুখ হয়ে গেছে যে, এখন তারা ধর্মকে পছন্দই করে না। আর ইসলামের বিরুদ্ধে সাধারণভাবেই খারাপ ধারণা করে থাকে আর ইসলামকে আপত্তির কেন্দ্রস্থলে পরিণত করে। ইসলামী শিক্ষাকে সেকেলে ও পশ্চাত্যের শিক্ষা আখ্যায়িত

করা হয়। তারা বলে, আজকের আধুনিক বিশ্বে এই শিক্ষার নাকি কোন স্থান নেই! কিন্তু ইসলামই এমন একটি ধর্ম যা প্রত্যেকের অধিকারের কথা বলে। স্বাধীনতার সীমা কতটা তা-ও বলে দেয় আর প্রত্যেকের সীমাও নির্ধারণ করে দেয় এবং এটি মধ্যমপন্থায় রাখার জন্য দিকনির্দেশনাও প্রদান করে।

২০১৯ সালের জলসার সমাপনী অধিবেশনে আমি বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের অধিকারের বিষয়ে বলেছিলাম যে, ইসলাম কীভাবে অধিকার প্রদান করে আর ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও এবিষয়ে উল্লেখ করব। কিন্তু আপাতত এখানে আমি নারীদের প্রেক্ষাপটে কিছু কথা বলতে চাই। সাধারণত ইসলামের বিরুদ্ধে এই আপত্তি করা হয় যে, ইসলাম নারীকে কোন স্বাধীনতা দেয় না। কিন্তু এটি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল আর আপত্তির খাতিরে আপত্তি। ইসলামের অনুপম শিক্ষার যে মৌলিক নীতি তা হল, শুধু অধিকার আদায়ের প্রতি জোর দিবে না বরং যদি সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ গড়ে তুলতে চাও তাহলে অধিকার প্রদানের প্রতিও মনোযোগী হও। আর প্রত্যেকের প্রতি যে দায়িত্ব অর্পিত আছে তা পালনের প্রতিও যদি গুরুত্বারোপ কর তাহলে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। ইসলাম যেভাবে সকলের অধিকারের কথা বলে সেভাবে সবার প্রতি দায়িত্ব পালনের প্রতিও গুরুত্বারোপ করে। শুধু নারীজাতিকে এটা বলে নি যে, তোমার অধিকার আদায় কর বরং বলেছে যে, তোমরা তোমাদের মর্যাদা কি সে সম্পর্কেও সচেতন হও আর অন্যায় করা থেকে বিরত থাক। এটি সেই সুন্দর শিক্ষা যা সত্যিকার অর্থে সর্বস্তরের মানুষের অধিকার ও বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। অতএব এই শিক্ষার মোকাবেলা অন্য কোন ধর্মের শিক্ষা করতে পারে না আর কোন বাহ্যিক আইনকানুন এর মোকাবেলা করতে পারে না। আমি যেভাবে বলেছি যে, এখন আমি নারীদের প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলব যা ইসলামে নারীজাতির পদমর্যাদা কি ও তাদের অধিকার কি তা-ও স্পষ্ট করে। আল্লাহ্ তা'লা অনেক জায়গায় নারীদের সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন যার ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশ আমরা মহানবী (সা.)-এর জীবনে দেখি। আর কত সুন্দরভাবে তিনি (সা.) নারীদের অধিকার তুলে ধরেছেন তা-ও স্পষ্ট হয়। এরপর এই যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ) নারীদের প্রতি সম্মান ও তাদের অধিকার আদায়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। এই বিষয়গুলোর দিকে যখন আমরা তাকাই যা নারীদের অধিকার সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে আর মহানবী (সা.)-এর কর্ম ও উক্তি ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উক্তি আর খলীফাগণ যা বলেছেন, এগুলোর দিকে যখন তাকাই এবং কোন আহ্‌মদী নারীর মুখে ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনে এ ধারণা দানাবাঁধার কোন কারণ থাকে না যে, ইসলাম (নাউযুবিল্লাহ) নারীদের অধিকার প্রদান করে নি বা অধিকার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি দেয় নি।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা) সূরা কাওসারের তফসীরে এটি বর্ণনা করেছেন যে, ইসলাম নারীদের যে মর্যাদা প্রদান করেছে তা ইসলামের আগে অন্য কোন ধর্ম দেয় নি বরং বলা উচিত, কোন জাগতিক আইন সেটি দেয় নি। কুরআন নারীদের অধিকারের কথা শুধু স্বীকারই করে না বরং এর প্রতি এত জোর দিয়েছে যে, জ্ঞানের এক নবদ্বার এর কারণে উন্মোচিত হয়েছে। নতুন নতুন কথা ও বিষয়াবলী এর কারণে সামনে আসে। পুরুষ-মহিলার মাঝে যখন বিয়ে হয় তখন যে আয়াতগুলো পাঠ করা হয় তাতে মহানবী (সা.) এমনসব আয়াত সংযুক্ত করেছেন যার মাধ্যমে নারীদের অধিকার কি-তা স্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا *(সূরা আন্ নিসা: ২)*

অর্থ: হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন নিবেদন করে থাক। আর তোমরা (বিশেষভাবে) রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তার ক্ষেত্রে (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের পর্যবেক্ষক।

অতএব আল্লাহ্ এটি স্পষ্ট করেছেন যে, পুরুষ-মহিলা একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাদের অনুভূতিও এক এবং তাদের উপকরণাদিও একই। পুরুষের যদি অনুভূতি থাকে তবে নারীদেরও অনুভূতি আছে। উভয়ে একই আবেগ-অনুভূতিতে আবদ্ধ। পুরুষের আবেগ অনুভূতি থাকলে নারীদেরও আছে। নারীদের কি কি অধিকার আছে বিয়ের আয়াতের সূচনাতেই আল্লাহ্ তা উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি পুরুষদের এ কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, তোমরা এটা মনে কর না, নারীদের কোন বিবেক নেই, তাই যেভাবে চাও শাসন করতে পার। নারীদেরও আবেগ-অনুভূতি আছে আর বিবেকবুদ্ধিও আছে। তাই নারীকে নিজের সমমর্যাদার মনে কর আর তাদেরকে তোমাদের চেয়ে তুচ্ছ মনে কর না। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারীদেরও পরামর্শ নেয়া উচিত। বাস্তবেও তিনি (সা.) মহিলাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন আর এর ফলাফলস্বরূপ একদা হযরত উমর (রা.)-এর স্ত্রী কোন বিষয়ে যখন তাকে পরামর্শ দেন তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, তুমি এই বিষয়ে নাক গলানোর

কে? তখন তার স্ত্রী উত্তরে বলেন, থামো! থামো! সেই সময় এখন আর নেই যে, আমাদের কোন অধিকার থাকবে না। অযথা আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা কর না। সেই দিন অতীত হয়ে গেছে। এখন তো মহানবী (সা.) তাঁর স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করেন এবং পরামর্শ নেন। তুমি আমাকে বাধা দেয়ার কে?

অতএব মহানবী (সা.) নারীজাতির অধিকারের ওপর এত জোর দিয়েছেন যে– তাদের মাথায় এটা গেঁথে গেছে, তারা পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। হযরত উমর (রা.)-এর ঘটনা থেকে বুঝা যায়, তিনি কোন নির্দেশ দিলে মহিলারা বলতো, আপনি তো আমাদের এই নির্দেশ দিতে পারেন না কেননা রসূলুল্লাহ (সা.) তো এর বিপরীত কথা বলেছেন। আপনি মহানবী (সা.)-এর বিপরীত কথা বলছেন। যাহোক, ঐ মহিলাদের কথা সঠিক হোক বা ভ্রান্ত; তারা ভুল বুঝেছেন নাকি হযরত উমর (রা.) কিংবা কি বুঝে এই কথা বলেছেন তা একপাশে রেখে আমি বলতে চাই, ইসলাম নারীদের সাময়িকভাবে মতামত বা পরামর্শ দেয়ার অধিকার দিয়েছে। আর এ বিষয়ে এত গুরুত্বারোপ করেছে, যার দৃষ্টান্ত অন্য ধর্মে দেখা যায় না। এখানে এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, সেই নারীরা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করার অনেক আগ্রহ রাখতেন। সাগ্রহে তারা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতেন। এ কারণেই তো তারা মহানবী (সা.)-এর বরাতে বলতেন, তিনি (সা.) এ বিষয়টা এভাবে বলে গেছেন। অতএব আহ্‌মদী নারীদের এ বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া উচিত। শুধু অধিকার আদায়ের কথা বলবেন না বরং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনেও এগিয়ে যাবার চেষ্টা করুন এবং নিজেদের সন্তানদেরও একই চেষ্টা-প্রচেষ্টা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার তরবিয়ত করুন। শুধু জাগতিক অধিকার আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দিবেন না। যেক্ষেত্রে কুরআন শরীফ ও ধর্মীয় জ্ঞান এখন আপত্তিকারীর হাসিঠাট্টার বিষয়ে পরিণত হয়েছে সেক্ষেত্রে তাদের আপত্তি খণ্ডনে আপনাদের যোগ্য করে তুলতে হবে। স্মরণ রাখবেন! এটি দাজ্জালি প্রতারণা। তারা স্বাধীনতা ও অধিকারের নামে যুবক ও নারীদের ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দিতে চায়। আর তারা চায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে যেন ইসলামের নামে এক ঘৃণার সৃষ্টি হয় অথবা তারা যেন এটা বলতে আরম্ভ করে যে, ইসলামী শিক্ষা আধুনিক হওয়া উচিত এবং তাদের অধিকারকে ইসলামের স্বীকৃতি দেয়া উচিত। ধর্ম থেকে যারা দূরে সরে যায় এরা সহানুভূতিশীল সেজে তাদের ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তাই এদের থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। আর এই শয়তানী আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তাদের আপত্তি তাদের মুখে ছুড়ে মারার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করুন। তাদের কথা দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। তাদের বলুন, তোমরা কীভাবে ইসলামের ওপর এই আপত্তি করতে পার, তোমাদের আপত্তি করার কোন সুযোগ নেই কেননা ইসলাম নারীজাতিকে যে স্বাধীনতা দেয়, যে নিরাপত্তা দিয়ে থাকে তা পৃথিবীর কোন ধর্ম দেয় নি আর কোন সংবিধানও দেয় নি। যে অধিকারের নাম তোমরা স্বাধীনতা রেখেছ, তা নারীজাতির পবিত্রতা, সম্ভ্রম ও সম্মানকে পদদলিত করে। বস্তুবাদী অনেক লেখকও লিখেছে যে, পুরুষেরা নারী-অধিকারের যে বুলি আওড়ায় তা তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা করে থাকে। তারা মহিলাদের স্বার্থে এসব করে না। অনেক কলামিস্ট এর সমর্থনে লিখেছে। অতএব তারা তাদের হীন কামনা-বাসনা চরিতার্থে এমনটি করে থাকে। নারীর জন্য নয় বা নারীর স্বার্থ রক্ষায় তারা এমনটি করে না, তাই খুব সাবধান থাকতে হবে। আহ্‌মদী মহিলারা অনেক সৌভাগ্যবতী কেননা তারা যুগের ইমামকে মেনেছে। যে ইমাম আমাদের সামনে প্রত্যেক বিষয়ে ইসলামের সুন্দরতম পবিত্র শিক্ষা তুলে ধরেছেন।

মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, ইসলাম যেভাবে নারী-অধিকারের সুরক্ষা করেছে তা অন্য কোন ধর্ম করে নি। তিনি (আ.) অতি সংক্ষেপে বিশদ বিষয় বর্ণনা করেন যে, **ওয়া লাহুন্না মিসলুল্লাযি আলাইহিন্না** তথা পুরুষের যেভাবে নারীদের ওপর কিছু অধিকার আছে একইভাবে নারীদেরও পুরুষের ওপর কিছু অধিকার রয়েছে। কারও কারও এমন কথা সামনে আসে যে, তারা নারীদেরকে নিজেদের জুতার সমতুল্য মনে করে আর অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ তাদের দিয়ে করিয়ে থাকে। তাদের গালিগালাজ করে ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। আর পর্দার শিক্ষাকে তাদের ওপরে এমনভাবে চাপায়, যেন তাদের জীবন্ত কবর দিয়ে দিল। স্ত্রীর সাথে স্বামীর সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত যেমন দু'জন বন্ধুর মাঝে আন্তরিক সম্পর্ক হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, মানুষের উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে প্রথম সাক্ষী এই নারীরাই হয়ে থাকে। আর মহিলাদের সাথেই যদি সম্পর্ক ভাল না হয় তাহলে কীভাবে খোদার সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হতে পারে! তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **খাইরুকুম খাইরুকুম লি আহলিহি**। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে, 'অধিকারের ক্ষেত্রে উভয়েরই অধিকার সমান'। কত গুরুত্বপূর্ণ কথা। তিনি (আ.) বলেন, নারীর সাথে যদি পুরুষের উত্তম সম্পর্ক না হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লার সাথেও তার উত্তম সম্পর্ক হতে পারে না। তাই পুরুষ যদি আল্লাহ্ তা'লার সাথে ভাল সম্পর্ক রাখতে চায় তাহলে তার উচিত নারীদের প্রাপ্য দেয়া। আমি যে আয়াত পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আল্লাহ্ তা'লা সেখানে এ কথাই বলেছেন যে, বিবেক, বুদ্ধি, আবেগ, অনুভূতি,

চেতনা এবং প্রেরণার দিক থেকে নারী-পুরুষ সমান। বিয়ের এলানের সময় যে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করা হয় সেগুলোর মাধ্যমে পুরুষদের চেতনাকে পরিষ্কার করা হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের মাথায় যদি কোন ভুল ধারণা থেকে থাকে তাহলে তা বের করে দাও। আর নারীকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, তোমাদের অধিকারের সুরক্ষার ব্যবস্থা করছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা। যদি কেউ এভাবে নারীর অধিকার প্রদান না করে তাহলে সে খোদার শাস্তিতে নিপতিত হবে। এমন শাস্তি থেকে মু'মিনদের সবসময় সতর্ক থাকা উচিত কিন্তু যে মু'মিন নয় তার কথা ভিন্ন। যে প্রকৃত মু'মিন তার এই বিষয়ে খুব ভয় পাওয়া উচিত। একজন আন্তরিকতাপূর্ণ বন্ধুর সম্পর্ক খুব দৃঢ় হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, এমন বন্ধন প্রতিষ্ঠা কর। এ সমাজে নারী-পুরুষ বিয়ের আগেই বন্ধুত্ব করে বিয়ে করে থাকে। ছেলে-মেয়ে বন্ধুত্ব করে আর বলে যে, আমরা খুব ভাল বন্ধু। এর ফলে বিয়ে হয় ঠিকই কিন্তু কিছুদিন পরেই এই বন্ধুত্ব ভেঙ্গে যায়। বিয়ের পূর্বে সম্পর্ক করে যে বিয়ে করা হয় তা দীর্ঘস্থায়ী হয়– একথা একেবারেই ভুল। এখানকার পরিসংখ্যান এ কথাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। এদেশে বিয়ের পূর্বে প্রেম করে যেসব বিয়ে হচ্ছে– সেগুলোই বেশি ভাঙ্গছে। মানুষ যদি প্রকৃত মু'মিন হয় আর যদি পরস্পরকে বিয়ের পূর্বে না-ও জানে তবুও তাদের দাম্পত্য জীবন কাটানো দেখে বুঝা যায়, তারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করছে। আরেকটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া উচিত, পিতামাতার পছন্দ অনুযায়ী মেয়েকে বিয়ে করতেই হবে– এটি আবশ্যক নয়। ইসলাম মেয়েকে অধিকার দেয় যে, তার অপছন্দ হলে সে বিয়ে না-ও করতে পারে। ইসলামের পূর্বে ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, পিতামাতা যেখানে ইচ্ছে সেখানে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিত। বরং আজকেও কোন কোন উন্নয়নশীল দেশে এমনটি হয়ে থাকে। পিতামাতা নিজেদের পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করতে মেয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বরং এই উন্নত দেশে এসেও এমন কাজে তারা লিপ্ত। তারা বলে, আমাদের পছন্দে, আমাদের আত্মীয়স্বজনদের ভিতর এবং আমাদের বংশে বিয়ে করতে হবে। আর যদি কোন মেয়ে এরূপ না করে তাহলে তাকে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু উত্তম রীতি হল, পিতামাতা দোয়া করে নিজেদের পছন্দের কথা মেয়ের সামনে ব্যক্ত করতে পারে কিন্তু মেয়েকে বাধ্য করা উচিত নয়। কেউ যদি বলে, মুসলমানরা এমনটি করে থাকে তাহলে এই দোষ ঐ সকল পিতামাতার যারা বল প্রয়োগ করে। এটি ইসলামী শিক্ষার কোন দোষ নয়। ইসলাম স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে, মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কোন বিয়ে হয় তাহলে তা বাতিল। তাই এটি অনেক বড় অধিকার যা কুরআন করীম এবং ইসলাম ধর্ম নারীকে প্রদান করেছে, এর পূর্বে যা কখনও কল্পনাই করা যেত না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমন এক বন্ধন যাতে তারা পরস্পরের গোপনীয়তা রক্ষা করে থাকে। একজন নারী তার স্বামীর অনেক গোপন বিষয়াবলী জেনে থাকে এবং গভীর দৃষ্টিতে স্বামীকে পরখ করে দেখে, তার ভিতর কি দোষ আছে আর কি গুণ আছে। আর পুরুষ যদি নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যা আল্লাহ্ তা'লা তার ওপর ন্যস্ত করেছেন তা সঠিকভাবে পালন না করে এবং ইসলামী শিক্ষার আলোকে স্ত্রীর অধিকার প্রদান না করে তাহলে একদিন তার স্ত্রী বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। আর সে এমন স্বামীকে বলতে পারে বা বলবে আর এটা বলার অধিকারও তার আছে যে, প্রথমে নিজেকে সংশোধন কর তারপর আমাকে বুঝাতে এস। অতএব বিভিন্ন পরিবারের ঝগড়ার সূচনা এখান থেকেই হয়ে থাকে। পুরুষ যখন স্বৈরাচারীর মত ঘর পরিচালনা করতে চায় আর অধিকার প্রদান না করে তখন তাকে তার স্ত্রীর আপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। অতএব ঘরে স্ত্রীর অধিকার প্রদান এবং স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য মহানবী (সা.)-এর এই উক্তিই যথেষ্ট– **'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজ পরিবার তথা স্ত্রীর কাছে উত্তম।'** মহানবী (সা.) নারীজাতিকে কী মহান অধিকার প্রদান করেছেন!

এছাড়া ইসলাম নারীকে পৃথক ঘরে বসবাসের অধিকার দিয়েছে। আজকের দিনে বিশেষকরে পাকিস্তান বা এশিয়ান সমাজে এই প্রশ্ন উঠে যে, এক গৃহে বসবাসের কারণে শ্বশুর শাশুড়ির সাথে স্ত্রীর ছোট ছোট বিষয়ে বনিবনা হয় না এবং দ্বন্দ্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় রূপ নেয়। আর এক পর্যায়ে গিয়ে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। একজন নারীর পৃথক ঘরে থাকার অধিকার আছে। যদি একান্ত বাধ্যবাধকতা না থাকে তবে পুরুষের উচিত স্ত্রীর এই বাসনা পূর্ণ করা। মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে বাধ্য করা উচিত নয়। সঙ্গতি থাকলে পৃথক ঘরে থাকা উচিত আর যদি সঙ্গতি না থাকে কিংবা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকে তাহলে চেষ্টা করা উচিত– পরিবেশ যখনই অনুকূলে হয় তখনই পৃথক ঘরে যাওয়া। এছাড়া মেয়েদের মোহরানা নির্ধারণ করা হয়েছে যেন তারা নিজের কোন সম্পত্তি বানাতে পারে এবং তাদের কাছে যেন সম্পত্তি গচ্ছিত থাকে আর এই সম্পত্তির ওয়ারিশ তারাই হবে। সম্পত্তিতে তাদেরকে উত্তরাধিকার করা হয়েছে। আজকে পৃথিবীতে নারীদের যে উত্তরাধিকার দেয়া হয় তা আজ থেকে কেবল একশ বা দেড়শ বছর পূর্বে থেকে, তারা পাওয়া শুরু করেছে। কিন্তু ইসলাম এটি প্রদান করেছে ১৫০০ বছর পূর্বে। বিয়ের পর নারীর সম্পত্তিকে একসময় তার

সম্পত্তি মনে করা হত না। কোনভাবে কোন সম্পত্তি তার হস্তগত হলে তার বিয়ে হোক বা না হোক কিংবা বিয়ের পরে সে কোন সম্পত্তি পেলে সেই সম্পত্তি আর তার সম্পত্তি থাকত না। কোন কোন ব্যক্তি সম্পদশালী নারীকে বিয়ে করে তার সম্পত্তি কুক্ষিগত করত। বিয়ের পরে স্বামীরা স্ত্রীর সম্পত্তি কুক্ষিগত করত কিন্তু ইসলাম অনেক আগেই নারীর সম্পত্তিকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি আখ্যায়িত করেছে এবং তাকে এমন স্বাধীনতা দিয়েছে যে, সেই যুগে সাহাবীরা সন্দেহে নিপতিত হয়েছিলেন, তাদের মনে প্রশ্ন দানা বেঁধেছিল যে, স্ত্রী দিতে চাইলেও তার সম্পত্তিতে স্বামীর কোন অধিকার আছে কিনা? সাহাবীরা এতটা সতর্ক ছিলেন যে, স্ত্রী দিলেও এটা বৈধ কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন জাগত। সাহাবীরা ততদিন এটি এড়িয়ে যেতে থাকেন যতদিন না সেই ইসলামী অধ্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, তথা নারীর সানন্দে দেয়া উপঢৌকন তোমরা গ্রহণ করতে পার এবং তা ব্যয়ও করতে পার। এক নারী যদি সানন্দে দেয় তাহলে নিতে পার।

ইসলাম ধর্ম মেয়েদের শিক্ষার প্রতিও জোর দিয়েছে এবং বলা হয়েছে, যার ঘরে দুই কন্যা সন্তানের জন্ম হয় আর সে যদি তাদের উত্তমভাবে তরবিয়ত করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যক্তির পাপ ক্ষমা করে দিবেন। এক মহিলা সাহাবী হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে আসেন, দরিদ্র এক মহিলা ছিলেন আর তিনি খাবার চান। তার সাথে দুই মেয়ে ছিল যাদের একজনকে ডান পাশে আর একজনকে বাম পাশে বসান। হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে তখন একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি সেই খেজুর ওই মহিলার হাতে তুলে দেন আর সেই মহিলা সেই খেজুর মুখে দিয়ে দুই ভাগ করে একভাগ এক মেয়েকে আর অন্যভাগ অপর মেয়েকে খাইয়ে দেন এবং নিজে ক্ষুধার্তই থেকে যান। এই হাদীসে যেভাবে মালী কুরবানীর বিষয় পরিলক্ষিত হয় আর অন্যদিকে এই হাদীসের মাধ্যমে মহানবী (সা.) সুন্দর একটি কথা স্পষ্ট করেছেন। মহানবী (সা.)-কে যখন এই কথা বলা হয় তখন তিনি (সা.) বলেন, 'যার দুই কন্যা, সে যদি তাদের উত্তম তালীম ও তরবিয়ত দেয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এমন মায়ের জন্য জান্নাত অবধারিত করে দেন।' চাকুরির জন্যই পড়ালেখা করতে হবে– এটি আবশ্যক নয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষিত করার জন্য এবং তাদের তালীম দেয়ার জন্য একজন নারীকে পড়াশুনা করা উচিত। কোন ট্রেনিং নিয়ে চাকুরি করা অন্যায় নয়, কিন্তু মহিলারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যদি পড়ালেখা করে তাহলে এটি সেই নারীকে, সেই মা-কে জান্নাতের শুভ সংবাদ দেয়। এই কথাটি অন্য আরেকটি হাদীসে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, **মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত**। অর্থাৎ সন্তানসন্ততির উন্নত শিক্ষাদীক্ষা শুধু মায়েদের জান্নাতেই নিয়ে যায় না বরং সন্তানদেরও জান্নাতে যাওয়ার কারণ হয়। কত বড় এই সম্মান– যা শুধু নারীকেই দেয়া হয়েছে কিন্তু পুরুষকে দেয়া হয় নি! এখানে মহিলাদের মহান মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের চাইতে মু'মিন নারী অনেক এগিয়ে থাকতে পারে। যে জাতির নারীরা শিক্ষিত হয়, তরবিয়তপ্রাপ্ত হয়, সন্তানদের ইসলামী শিক্ষার আলোকে যেসব মায়েরা তরবিয়ত দেয়, সেক্ষেত্রে এমন ছেলে ও মেয়ে যারা সামনে আসবে তারা পুণ্য ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে অভ্যাস ও শিক্ষার অমিল থাকার কারণে বিয়ে ভাঙ্গার বা আলাদা হবার যে অনুমতি ইসলাম দিয়েছে তা-ও দু'জনকে সমান দিয়েছে। পুরুষ তালাক দিতে পারে আর মহিলা খোলা নিতে পারে। পুরুষদের জন্য নির্দেশ হল, তুমি যখন তালাক দিবে সেক্ষেত্রে স্মরণ রাখবে, মহিলার ওপরে যেন কোন অত্যাচার না হয়। যদি অন্যায়-অত্যাচার করা হয় তাহলে এটি অনেক বড় অপরাধ। অন্যায় অপকর্ম আর জুলুমের শাস্তি আল্লাহ্ তা'লা দিয়ে থাকেন। তালাকের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা পুরুষদের সম্বোধন করে বলেন,

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(সূরা আল্ বাকারা: ২২৮)

অর্থ: আর তারা যদি তালাক দেয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যা পুরুষদের পক্ষে নয়। তিনি (আ.) বলেন, যদি পুরুষ তালাকের ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় তাহলে তার শুনে রাখা উচিত, আল্লাহ্ শুনেন ও জানেন। অর্থাৎ যেই নারীকে তালাক দেয়া হয়েছে, খোদার দৃষ্টিতে সে যদি নির্যাতিতা হয় আর সেই মহিলা যদি অভিশাপ দেয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সেই পুরুষের বিপক্ষে এই মহিলার অভিশাপ আমলে নিবেন। এই আয়াতে পুরুষদের সাবধান করা হয়েছে যে, চিন্তাভাবনা করে তালাকের সিদ্ধান্ত নিও। অনর্থক তুচ্ছ কারণে নারীকে তালাক দিবে না। আল্লাহ্ যদি তোমাদের কথা শুনে থাকেন আর জানেন তাহলে মহিলার কথাও তিনি জানেন আর তার অবস্থাও আল্লাহ্ তা'লার কাছে স্পষ্ট। অন্যায়ভাবে যদি তাকে পরিত্যাগ কর তাহলে সেই মহিলা আল্লাহ্‌র কাছে সেই জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিশোধের জন্য দোয়া করতে পারে। আর আল্লাহ্ তা'লা নির্যাতিত মানুষের দোয়া কবুল করেন। এখানে তো সেসব পুরুষদের সাবধান করা হয়েছে যারা তাড়াহুড়া করে তালাক দেয়। সর্বোপরি এখানে আল্লাহ্ তা'লা নারীদের অধিকার নিশ্চিত করেছেন।

আরেকটি আপত্তি করা হয় যে, পুরুষদের একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়ে নারীদের অধিকারকে পদদলিত করা

হয়েছে। সত্য কথা হল, কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন। তবে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দেন নি যে, বিয়ে করতেই হবে। আর এই নির্দেশ মানারও কিছু শর্ত আছে। এই উন্নত বিশ্বে এক বিয়ে করে অনেক মহিলার সাথে অন্যায় সম্পর্ক রাখা হয়। আমরা প্রত্যহ এমন খবর শুনতে পাই। এটি নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা যার অনুমতি ইসলাম কোনভাবেই দেয় না। আর এর পরিণতি হল, স্ত্রী যখন স্বামীর অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতে পারে তখন তালাকের পরিস্থিতি সামনে আসে। তাই ইসলামের একাধিক বিয়ে নিয়ে এদের আপত্তি করার কোন সুযোগ নেই। দ্বিতীয়ত: আল্লাহ্ তা'লা একাধিক শর্ত সাপেক্ষে একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন। শর্ত যদি পূর্ণ না হয় তাহলে একাধিক বিয়ের অনুমতি নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ) একাধিক বিয়ে করার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, স্ত্রীদের অধিকার এমন, মানুষ যদি সে সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে বিয়ে করার পরিবর্তে সবসময় অবিবাহিত থাকাই পছন্দ করবে। আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষার মধ্যে থেকে যে জীবনযাপন করবে সে-ই সে শিক্ষা পালনে সচেষ্ট। এদিকে যদি মানুষের জানা থাকে যে, বিয়ের পরে স্ত্রীর অধিকার আদায় না করা কত বড় পাপ কাজ তাহলে মানুষ এক বিয়েও করত না বরং বিয়ে ছাড়াই থেকে যাওয়া সে পছন্দ করত যদি সে সত্যিকারে মু'মিন হয়। শরীয়ত একাধিক বিয়ে চিকিৎসাস্বরূপ প্রস্তাব করেছে। অর্থাৎ যেখানে একাধিক বিয়ের কথা বলা হয়েছে তা কেবল চিকিৎসাস্বরূপ। প্রথম স্ত্রীর মন জয় করার চেষ্টা করা উচিত, কোন পুরুষ যদি একাধিক বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করে এবং পাশাপাশি দ্বিতীয় স্ত্রী আনলে প্রথম স্ত্রীর মনে কষ্ট হবে কিংবা মন ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে এমন ক্ষেত্রে তার ধৈর্যধারণ করা উচিত। আর সে যদি এই ধৈর্যধারণের জন্য কোন পাপে লিপ্ত না হয় আর শরীয়ত ভঙ্গ না করে তাহলে এমন অবস্থায় আগের স্ত্রীর জন্য সে যদি তার ইচ্ছাকে ত্যাগ করে আর পূর্বের স্ত্রীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। পুরুষের যদি একান্তই বাধ্যবাধকতা না থাকে তাহলে স্ত্রীর মন জয় করা আবশ্যক। বলা হয়েছে, এমন প্রয়োজনের সময় ত্যাগ স্বীকার কর আর পূর্বের স্ত্রীর মন জয় করার চেষ্টা কর। আর দ্বিতীয় বিয়ে কর না। তিনি (আ.) বলেন, মনে কষ্ট দেয়া অনেক বড় পাপ কাজ। আর মেয়েদের অবস্থা অনেক নাজুক হয়ে থাকে। তার মা-বাবা যখন তাকে নিজেদের থেকে পৃথক করে অন্য ঘরে দিয়ে দেয় তখন চিন্তা করে দেখ, তাদের মনের অবস্থা কেমন হয়ে থাকে? **'আশিরুহুন্না বিল মারুফ'** এই নির্দেশের অধীনেই তারা একাধিক বিবাহ করতে পারে। অতএব মহানবী (সা.) মহিলাদের আবেগ-অনুভূতি এবং তাদের অধিকারের কথা দৃষ্টিপটে রেখে পুরুষদের নসিহত করেছেন। তিনি (আ.) এমনও বলেছেন, বিয়ের সময় মহিলাদের এই শর্ত দেয়ার অধিকার রয়েছে যে, তার স্বামী যেন কোন অবস্থাতেই দ্বিতীয় বিয়ে না করে। অর্থাৎ যাকে বিয়ে করছে তার কাছ থেকে মহিলাদের ওয়াদা নেয়ার অধিকার আছে যে, পরবর্তীতে পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। এমনটি হলে পুরুষ দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। অতএব মহিলাদের এতটা পর্যন্ত অধিকার দেয়া হয়েছে!

আবার পুরুষদের ওপর মহিলাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে এবং মহিলাদের অভিভাবক তার স্বামী হয়ে থাকে। তাই পুরুষের উচিত ঘরের সব বিষয়ে খেয়াল রাখা। তারা যেন ঘরের অধিকার প্রদান করে আর স্ত্রী ও সন্তানদের খেয়াল রাখে। মহিলারা আয়-উপার্জন করলেও তার সম্পত্তির ওপর লোভাতুর দৃষ্টি দেয়া যাবে না। যদি সে নিজ ইচ্ছায় ব্যয় করে তাহলে তা ভিন্ন বিষয়। বরং নিজে নিজের দায়িত্ব পালন করবে। আবার পুরুষদের শারীরিকভাবেও অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সে যেন কোনভাবেই তাদের কষ্ট না দেয়। ঘরে অনেক বিষয়ে মতপার্থক্য হয়ে যায় তারপরেও এমন কথা যেন না বলে বা রেগে গিয়ে যেন হাত না তোলে বা মহিলাদের কষ্ট না দেয়। মহিলাদের যে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, স্ত্রীর দায়িত্ব পালনের যে কথা বলা হয়েছে– তা যেন পুরুষ মন্দ কাজে না লাগায়। এখানে মেয়েদের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। আর পুরুষদের তাদের দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এই অগ্রাধিকার সব বিষয়ে নয় বরং কিছু বিষয়ে আছে।

একবার অনুযোগ করা হয় যে, পুরুষরা বেশি পুণ্য করে থাকে অর্থাৎ জিহাদ করে থাকে যাতে অনেক পুণ্য আছে কিন্তু আমরা নারীরা এ থেকে বঞ্চিত আছি। আমরা তো ঘরেই বসে থাকি আর ঘরের দায়িত্বই পালন করে থাকি। সন্তানদের দেখাশোনা করি, ঘরের দেখাশোনা করি তাহলে আমরা কি আমাদের দায়িত্ব পালন করে পুরুষদের সমান পুণ্যের ভাগিদারী হতে পারি? জাগতিক দিক থেকে আমরা দুর্বল হলে আমাদের পুণ্যতে তো সমান হওয়া দরকার। আমরা কি এর সমান হব না? মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা নারীদের দুর্বল মনে কর কিন্তু তারাও তাদের দায়িত্ব পালন করে তোমাদের সমান হতে পারে। অতএব প্রত্যেক বিষয়ে তোমরা শুধু নিজেদেরই বড় মনে কর না। মহিলারাও অনেক বিষয়ে তোমাদের থেকে বড় হতে পারে। তখন প্রশ্নকারী মহিলাকে বলল যে, তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদের ভালভাবে দেখাশোনা কর আর স্বামীর উপস্থিতিতে আর অনুপস্থিতেও ঘরের দেখাশোনা সঠিকভাবে পালান কর তাহলে তোমাদের পুরস্কার পুরুষদের সমান। তাদের পুণ্যে কোন ঘাটতি হবে না। জিহাদে শামিল

হয়ে তাদের যে পুণ্য হচ্ছে সেই একই পুণ্য ঘরে অবস্থানকারী নারীর লাভ হয়ে থাকে। এই কথা শুনে ঐ মহিলা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবর'** বলতে বলতে খুশিতে ঘরে ফিরে গেল।

অতএব পুরুষদের কিছু ফরয দায়িত্বের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে আর যদি পুরুষ সেই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। ইসলামে মহিলাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আর তাদের পুণ্যও পুরুষদের সমান। শর্ত হচ্ছে শুধু সে তার দায়িত্ব পালন সঠিকভাবে করবে। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী আমল করবে। তাই তোমরা ইসলামী শিক্ষাসমূহ সঠিকভাবে না বুঝার কারণে নিজেকে লজ্জিত মনে করবে না। দাজ্জালি ফিতনায় নিপতিত হয়ে এটাকে অন্যায় বোঝা মনে করবে না।

পর্দার ব্যাপারেও ইসলামের একটি হুকুম আছে। বিগত দিন কেউ আমাকে লিখেছে, এখানের পুরুষরা আমাদের এশিয়ান দেশসমূহের পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের দিকে ফিরে তাকায় না, তাই এখানে পর্দা করার আবশ্যকতা কী? ইসলামী পর্দার এখানে আবশ্যকতা কী? প্রথমত যে বিষয়টি স্মরণ রাখা আবশ্যক তা হল, আল্লাহ্ তা'লার কোন আদেশ এমন নয় যেটিকে আমরা আত্মার প্রবঞ্চনার কারণে ভুল ব্যাখ্যা করে সময়োপযোগী বলে আখ্যা দিব। একথা স্মরণ রাখবেন, ইসলাম ধর্ম যেখানে মহিলাকে পর্দা করার এবং চোখ অবনত রাখার আদেশ দিয়েছে, সেখানে প্রথমে পুরুষকে এই আদেশ দেয়া হয়েছে। যদি একটি সত্যিকার ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা থাকে এবং সেখানে পুরুষ চোখ অবনত রাখে তবুও মহিলাদের জন্য আদেশ হল, তোমরাও দৃষ্টি অবনত রাখবে এবং পর্দা করবে। মহানবী (সা.) পুরষদেরকে বাজারে বসা অবস্থায় দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, নিজের চোখ চতুর্দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা মু'মিনের শোভা পায় না। বরং **"ইয়াগুযযু মিন আবসারিহিম"** *(সূরা আন নিসা: ৩১)*। অনুযায়ী আমল করে চোখ অবনত রাখা উচিত। এবং কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে সংযত রাখা উচিত। অতএব পুরুষ দেখছে না তাই পর্দা আর শালীন পোষাক পরিধানের আবশ্যকতা নেই- এটি কোন দালিলিক কথা নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, বর্তমানে পর্দার ওপর আক্রমণ করা হয়। কিন্তু এরা জানে না, ইসলামী পর্দা দ্বারা জেলখানা বুঝায় না বরং এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা যেন না-মাহরাম একে অপরকে দেখতে না পায়। যখন পর্দা করা হবে তখন হোঁচট থেকে রক্ষা পাবে। মন্দ পরিণতি বাধা দেয়ার জন্য ইসলামী শরীয়ত এমন কথা বলার অনুমতি দেয় না যা কারও হোঁচটের কারণ হয়। পথমেই সাবধান করে দিয়েছে যেন মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়া য়ায়। যদি কোন স্থানে না-মাহরাম ছেলে-মেয়ে একত্রিত হয় সেখানে তৃতীয়জন থাকে শয়তান। যদি কোন জিনিসকে খেয়ানত থেকে রক্ষা করতে চাও তাহলে সুরক্ষা কর। কিন্তু যদি সুরক্ষা না কর আর মনে কর যে, মানুষ তো ভাল হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে স্মরণ রাখবে! সেই জিনিস অবশ্যই ধ্বংস হবে।

অতএব যাদের মনে এই প্রশ্ন আসে, তাদের স্মরণ রাখা উচিত, ইসলাম ধর্ম কোন ভুল এবং গুনাহ থেকে রক্ষা লাভের উপায় বলে দিয়েছে আর তদনুযায়ী যারা আমল করবে তারা তাদের মানসম্ভ্রম রক্ষা করতে সক্ষম হবে। ইসলামের প্রতিটি আদেশ মধ্যমপন্থা অবলম্বনের। তাই পর্দার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িকেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খণ্ডন করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, ইসলামী পর্দা দ্বারা আদৌ এ কথা বুঝানো হয় নি যে, মহিলাদেরকে জেলখানার ন্যায় বন্দী করে রাখা হোক। কুরআনের নির্দেশ হল, মহিলা যেন পর্দা অবলম্বন করে। তারা যেন পরপুরুষকে না দেখে। যেসব মহিলার বাধ্য হয়ে ঘরের বাইরে যেতে হয় তাদের ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ নয়। তারা নিঃসন্দেহে বাইরে যেতে পারে। তবে চোখের পর্দা আবশ্যক। যেভাবে এক জায়গায় তিনি বলেছেন, মাথার চুল, গাল ও থুতনি ঢেকে রাখো। আবার পবিত্র কুরআনে বলা আছে, নিজেদের বক্ষদেশ ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখো এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ কর না। তিনি (আ.) বলেন, পুণ্যের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলার মাঝে কোন বৈষম্য রাখা হয় নি এবং না-ই তাদের পুণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলাম তাদেরকে কবে এবং কোথায় শিকলাবদ্ধ করে রাখার আদেশ দিয়েছে? ইসলাম ধর্ম কামনা-বাসনার মূলোৎপাটন করে। নামসর্বস্ব উন্নত বিশ্বের দিকে তাকাও, দেখ সেখানে কী হচ্ছে? এটি কোন শিক্ষার প্রভাব। পত্র-পত্রিকায় এখানেও অনেক অনৈতিক বিষয়ের খবর আসে। তিনি (আ.) বলছেন, এটি কি পর্দা করার কারণে না কি পর্দা না করার কারণে ঘটছে? ইসলাম ধর্ম পৃথিবীতে এসেছে মানুষকে তাকওয়া শেখানোর জন্য। তাই আমাদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করা আবশ্যক তাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুযায়ী চলা অবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সদা তাকওয়ার পথে চলার সৌভাগ্য দিন। প্রত্যেক আহমদী মহিলা এবং প্রত্যেক আহমদী মেয়েকে নিজের অবস্থান বুঝা আবশ্যক। এছাড়া আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) প্রদর্শিত পথে চলে নিজেদের পরিপাটি জীবনযাপন করা আবশ্যক। স্বাধীনতা এবং অধিকারের নামে অন্ধ অনুকরণে জাগতিক লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা অনুচিত হবে। বরং পৃথিবীকে মহিলার মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়ে অবগত করা আজ আহমদী মহিলা এবং আহমদী মেয়েদের দায়িত্ব। এর জন্য কোন হীনমন্যতার শিকার না হয়ে প্রত্যেকের চেষ্টা করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর সৌভাগ্য দিন। (আসুন দোয়া করি)

ভাবানুবাদ: পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' ডেস্ক

নযম

হযরত নবাব মোবারাকা বেগম সাহেবা (রা.)

میری پہچان

رکھ پیش نظر وہ وقت بہن! جب زندہ گاڑی جاتی تھی
گھر کی دیواریں روتی تھیں ، جب دنیا میں تو آتی تھی

جب باپ کی جھوٹی غیرت کا، خوں جوش میں آنے لگتا تھا
جس طرح جنا ہے سانپ کوئی، یوں ماں تیری گھبراتی تھی

یہ خونِ جگر سے پالنے والے تیرا خون بہاتے تھے
جو نفرت تیری ذات سے تھی فطرت پر غالب آتی تھی

کیا تیری قدروقیمت تھی؟ کچھ سوچ! تری کیا عزت تھی
تھا موت سے بد تر وہ جینا قسمت سے اگر بچ جاتی تھی

عورت ہونا تھی سخت خطا، تھے تجھ پر سارے جبر روا
یہ جرم نہ بخشا جاتا تھا، تا مرگ سزائیں پاتی تھی

گویا تو کنکر پتھر تھی، احساس نہ تھا جذبات نہ تھے
توبین وہ اپنی یاد تو کر! ترکہ میں بانٹی جاتی تھی

وہ رحمت عالم آتا ہے، تیرا حامی ہو جاتا ہے
تو بھی انساں کہلاتی ہے، سب حق تیرے دلواتا ہے
ان ظلموں سے چھڑواتا ہے-

بھیج درود اس مُحسن پر تو دن میں سو سو بار
پاک محمدؐ مصطفیٰ نبیوں کا سردار
صل علیٰ نبینا صل علیٰ محمد

মেরী প্যাহচান

রাখ পেশে নাযার উওহ ওয়াক্ত ব্যাহেন! জাব যিন্দা গাড়ী জাতী থী
ঘার কি দিওয়ারেঁ রোতী থী, জাব দুনিয়া মেঁ তু আতী থী।

জাব বাপ কী ঝুটি গায়রাত কা, খুঁ জোশ মেঁ আনে লাগতা থা
জিস তারাহ জানা হ্যা সাঁপ কোঈ, ইউঁ মাঁ তেরী ঘাবরাতী থী।

ইয়ে খুনে জিগার সে পালনে ওয়ালে তেরা খুন বাহাতে থে
জো নাফরাত তেরী যাত সে থী, ফিতরাত পার গালেব আতী থী।

কিয়া তেরী কাদার ও কিমাত থী? কুছ সোচ! তেরী কিয়া ইযযাত থী
থা মওত সে বাদতার উওহ জিনা, কিসমাত সে আগার বাচ জাতী থী।

অওরাত হোনা থী সাখত খাতা, থে তুঝ পার সারে জাবার রাওয়া
ইয়ে জুর্‌ম না বাখশা জাতা থা, তা মার্‌গ সাযায়েঁ পাতী থী।

গোয়া তু কাঙ্কার পাত্থার থী, এহসাস না থা জাযবাত না থে
তওহীন উওহ আপনী ইয়াদ তো কার! তারকা মেঁ বাঁটী জাতী থী।

উওহ রাহমাতে আলাম আতা হ্যা, তেরা হামি হো জাতা হ্যা
তু ভী ইনসাঁ ক্যাহলাতি হ্যা, সাব হাক্ব তেরে দিলওয়াতা হ্যা;
ইন যুলমোঁ সে ছোড়ওয়াতা হ্যা।

ভেজ দরূদ উস মুহসেন পার তু দিন মেঁ সো সো বার
পাক মুহাম্মদ মুস্তাফা নাবিয়োঁ কা সারদার।

সাল্লি আলা নাবিয়্যিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ॥

আমার অস্তিত্ব

সেই সময়কে স্মরণ রেখ হে আমার বোন! যখন তোমাদের জীবিত মাটিতে পুঁতে ফেলা হত;
তুমি এই ধরাধামে আসলে বাড়িঘরের দেয়াল পর্যন্ত কেঁদে উঠত।

পিতার মিথ্যা আত্মাভিমান, রক্ত টগবগ করে বলক দিত;
যেন কোন সাঁপের জন্ম দিয়েছে– এই ভয়ে মা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত।

কলিজার টুকরার মত পেলেপুষে তারাই আবার তোমার রক্ত ঝরাত;
তোমার সত্তার প্রতি যে ঘৃণা ছিল তা তাদের আচরণে ফুঁটে উঠত।

তোমার কি-ই বা মূল্য ও মর্যাদা ছিল? একটু চিন্তা কর! তোমার সম্মানই-বা কি ছিল!
ভাগ্যক্রমে যদি কেউ বেঁচে যেত তবে তার জীবন হত মৃত্যুর চেয়েও জঘন্য।

মেয়ে হয়ে জন্মানো যেন ছিল মহাভুল, তোমার উপর চলতো বেদম নির্যাতন;
এই অপরাধ ক্ষমা করা হত না যার ফলাফলস্বরূপ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমরা শাস্তি পেতে।

এমন মনে হত যেন তোমরা কোন কঙ্কর-পাথর, যাদের কোন আবেগ-অনুভূতি ছিল না;
নিজেদের সেই লাঞ্ছনার কথা স্মরণ কর যখনকিনা পরিত্যক্ত জিনিসরূপে তোমাদেরকে বণ্টন করা হত।

পরিশেষে সারাবিশ্বের জন্য রহমতরূপে তিনি (সা.) আসলেন তোমাদের সমর্থনে;
তোমরাও মানুষ নামে অভিহিত হলে, সমস্ত অধিকার তিনি (সা.) তোমাদের প্রদান করলেন।
আর এই অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে তোমাদের রক্ষা করলেন।

তুমি দরূদ প্রেরণ কর সেই অনুগ্রহকারীর (সা.) প্রতি দিনে শতবার;
পবিত্র সেই সত্তা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) নবীদের সর্দার।

আমাদের সেই নবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর, মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর।

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মেয়ে হযরত নওয়াব মুবারেকা বেগম সাহেবা (রা.)-এর লেখা এই নযমটি নারীদের জন্য একটি যুগান্তকারী নযম। প্রত্যেক আহমদী মেয়ের অত্যন্ত আবেগভরা হৃদয় নিয়ে এই নযমটি পাঠ করা উচিত, কেননা এখানে আইয়ামে জাহিলিয়্যাতে নারীদের কত করুণ অবস্থা ছিল তা বর্ণনা করা হয়েছে এবং 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' মহানবী (সা.)-এর আগমনের পর নারীরা কি অধিকার ও মর্যাদা লাভ করেছে তা বর্ণনা করা হয়েছে। লেখিকা মূলত এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলছেন, সুতরাং তোমরা মহানবী (সা.)-এর প্রতি সারাদিন অজস্রধারায় দরূদ প্রেরণ কর।]

০৭ আগস্ট, ২০২১ যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে
জলসা সালানায় প্রদত্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর বক্তৃতা

বিষয়: বছরব্যাপী জামা'তের কর্মকাণ্ডের পরিসংখ্যান

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বছর জুড়ে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যে কাজ হয়ে থাকে তা আজকের দিনে উল্লেখ করা হয়। সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও অনেক রিপোর্ট আছে। এর মধ্য থেকে আমি কিছু রিপোর্ট উপস্থাপন করব বা কিছু তথ্য-উপাত্ত বলব।

নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠা

এবছর সারা বিশ্বে পাকিস্তান ছাড়া সারাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৪০৩টি। নতুন জামা'ত ছাড়া ৮২৯ জায়গায় প্রথমবারের মত জামা'তের চারাগাছ রোপিত হয়েছে তথা প্রথমবার কোন না কোন ব্যক্তি জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নাইজেরিয়া নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠায় ১ম স্থান অধিকার করেছে। গত বছরে সেখানে ৮৯টি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর যথাক্রমে কঙ্গো কুনশাসা, সিয়েরালিওন, গ্যাম্বিয়া, ঘানা, লাইবেরিয়া ইত্যাদি। এছাড়া ইউরোপের কিছু দেশও রয়েছে।

নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠার ঘটনা লিখতে গিয়ে সাউথ ওমের মোবাল্লেগ ইনচার্য সাহেব লেখেন, সাউথ ওম দেশটি তিনটি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। সাউথ ওম এবং প্রিন্সেফ দ্বীপে পূর্বেই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মসজিদও নির্মিত আছে। এ বছর তৃতীয় দ্বীপেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের সূচনা হয়েছে। সেখানে আমাদের স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেব গিয়েছিলেন এবং তবলীগ করেন। এরপর মুরব্বী সিলসিলাহ্ সেখানে যাওয়ার পর সেখানের লোকদের সাথে সাক্ষাত করেন, তারা পূর্বেই আহমদীয়াতের বাণী সম্বন্ধে অবগত ছিল। তবলীগ শোনার পর আল্লাহ্ তা'লা তাদের ১০জন ব্যক্তিকে খ্রিষ্টধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য দিয়েছেন। এটি ছোট একটি দ্বীপ। শতের কম লোক সেখানে বসবাস করে। সব মিলিয়ে দ্বীপের ব্যাপ্তি দুই থেকে তিন বর্গকিলোমিটার হবে। যাহোক এ দ্বীপেও আল্লাহ্ তা'লা জামা'ত প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য দিয়েছেন।

তানযানিয়ার মুরব্বী সাহেব লেখেন, এই জেলার একটি গ্রামে আমাদের তিনজন মোয়াল্লেম সাহেব তবলীগের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। তবলীগী প্রোগ্রাম হয় এবং লোকেরা জামা'তের সংবাদ মনোযোগের সাথে শোনে এবং ৬০জন সদস্য বয়আত করে আহমদী হয়ে যান। তখন স্থানীয় ইমাম ফোন করে বলে, আপনাদের মোয়াল্লেম এখানে এসেছে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির পায়তারা করছে। আমার লোকেরা তার সাথে যোগ দিচ্ছে। আপনাদের মোবাল্লেগকে পুনরায় প্রেরণ করুন যেন আমরা বসে কথা বলতে পারি আর তাদেরকে বলে দিবেন, তারা যেন তবলীগ না করে। তার ফোন করা অবস্থায় মোয়াল্লেম সাহেব সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। সে বলে, মোয়াল্লেম সাহেব এসে গেছেন একথা বলে ফোন রেখে দেয় আর মোয়াল্লেম সাহেবের সাথে বিতর্ক শুরু করে দেয় আর বলে, আপনি আমার লোকদেরকে টেনে নিচ্ছেন, আপনি ভাল কাজ করছেন না। এ লোকদের সাথে তার রুটি রোযগারের প্রশ্ন আছে তাই সে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিল। যাহোক, আমাদের মোয়াল্লেম সাহেব তাকেও তবলীগ করা শুরু করে দেন। স্থানীয় ইমামের মোখালেফাত দেখে স্থানীয়রা সেখানে জড়ো হয়ে যায়। এর ফলাফল যা দাঁড়াল, স্থানীয় ইমামের বিতণ্ডার কারণে যারা সেখানে জড়ো হয়েছিল তাদের মাঝে আরও ৩০জন ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণ করে। সেই সুন্নি ইমাম মসজিদে সেভাবেই বসে থাকে আর তার কাছে কেবল দু'একজন লোক থেকে যায়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানে ৯০জন সদস্য সম্বলিত এক জামা'ত প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা চাঁদার ব্যবস্থাপনায়ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন।

গিনি কোনাকরিতেও একটি গ্রাম আছে যেখানে আমাদের তবলীগী প্রতিনিধিদল যায়। তাদেরকে ইসলামিক লীগের লোকেরা খুব হুমকিধামকি দেয় যে, আহমদীরা কাফের এবং ইসলামের সাথে তাদের দূরতম সম্পর্ক নেই- নাউযুবিল্লাহ। তাদের কোন কথা তোমরা শুনবে না। কিন্তু তাদেরকে যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী শোনানো হল আর উম্মতে মুসলিমার মাঝে আগমনকারী ইমাম মাহ্দীর বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে বলা হল, তখন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে, আমরা আমাদের বুযূর্গদের কাছ থেকে শেষ যুগে মুসলিম উম্মাহ্র পথভ্রষ্টতা এবং একজন সংস্কারকের আগমনের বিষয়ে শুনতাম। আপনাদের কথা আমাদের ভাল লেগেছে। অতএব ইমামসহ সমস্ত গ্রামের লোক আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এবং সেখানে নিয়মিত নেযামে জামা'ত প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। এতদসত্ত্বেও সেখানে আশপাশের লোকেরা তাদেরকে হুমকিধামকি দিয়েছে তথা সেইসব ইসলামিক লীগ আরব মুসলমানরা। কিন্তু তারা বলে, আহমদীয়াত কবুল করে আমাদের যে ঈমান লাভ হয়েছে আর এখন আমাদের ইবাদাতে আমরা যে স্বাদ লাভ করছি, তা ইতিপূর্বে ছিল না। আমরা এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদী মুসলমান আর সদা আহমদীই থাকবো। তোমাদের যা করার আছে কর, আমরা আহমদীয়াত পরিত্যাগ করব না। অনেক ইমামও পুণ্যাত্মার অধিকারী হয়ে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় তাদের বক্ষ উন্মুক্তও করে দেন। তাই তারা আহমদীয়াতের বাণী শোনে, বোঝে এবং আহমদীয়াতে প্রবেশ করে।

অগণিত ঘটনার মাঝে এখানে এই কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হল।

নতুন মসজিদ নির্মাণ এবং জামা'তের হস্তগত মসজিদসমূহ

এবছর জামা'তের যেসব নতুন মসজিদ বানানোর সৌভাগ্য হয়েছে তার মোট সংখ্যা ১৩৫টি। ৭৬টি পূর্বনির্মিত মসজিদ আমাদের হস্তগত হয়েছে। অতএব সর্বমোট ২১১টি মসজিদ গতবছর যুক্ত হয়েছে। আফ্রিকার ঘানায় সবচেয়ে বেশি মসজিদ নির্মিত হয়েছে তথা ৩১টি। এরপর যথাক্রমে সিয়েরালিওন, বেনিন, তানযানিয়া এভাবে আরও কিছু দেশ এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত।

প্রিন্সেফ দ্বীপে জামা'তে আহমদীয়ার প্রথম মসজিদ। সাউথ ওমের বিষয়ে পূর্বেই বলেছি যে, তিনটি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। এবছর প্রিন্সেফের গ্রাম পোর্তরেয়ালে জামা'তের প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এক খ্রিষ্টান বন্ধু মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। তিনি বলেন, আমাদের এই উপদ্বীপে পূর্বে কোন মুসলমান বাস করত না। মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে বলা হয়, ইসলাম খুব খারাপ ধর্ম। কিন্তু যখন থেকে আহমদীয়া মুসলিম জা'মাত আমাদের এই উপদ্বীপে এসেছে তখন আমরা বুঝতে পেরেছি, ইসলাম খুব ভাল ধর্ম এবং শান্তিপ্রিয় ধর্ম। আমরা সবাই এখানে মিলেমিশে বসবাস করব। এভাবে আরও অনেকে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

বেলিজ জামা'তে আহমদীয়ার প্রথম মসজিদ 'মসজিদে নূর' নির্মিত হয়েছে। প্রায় ২ একর জায়গার ওপর এ মসজিদ নির্মিত। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে এই মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়। ২২০ জন লোক একত্রে এ মসজিদে নামায আদায় করতে পারে। মসজিদটির নির্মাণশৈলী খুবই চিত্তাকর্ষক। মিশনারী অফিস আছে, মিশন হাউজও আছে, এছাড়া লাইব্রেরীও আছে এবং অতিথিদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা আছে। বেলিজ শহর থেকে দুটি মহাসড়ক বেরিয়েছে যার একটি দিয়ে মেক্সিকো যাওয়া যায় আর অপরটি দিয়ে গোয়েতামালা- যেটি দক্ষিণ বেলিজমুখী। মসজিদে নূর গোয়েতামালাগামী মহাসড়কের পাশে নির্মিত এবং সিটি সেন্টার থেকে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। যদি গোয়েতামালা থেকে বেলিজ শহরে যাওয়া হয় তাহলে প্রথম যে গোলচক্কর পড়ে তার এক কিলোমিটার দূরে মসজিদে

নূর অবস্থিত এবং সেই গোলচক্করে জামা'তের সাইনবোর্ড টাঙানো আছে আর সেখান থেকে মসজিদও দেখা যায়।

মিশন হাউজ ও তবলীগ সেন্টার প্রতিষ্ঠা

এবছর ১২৩টি নতুন মিশন হাউজ সংযুক্ত হয়েছে। এদিক দিয়ে প্রথমে ঘানা, এরপর নাইজেরিয়া, সিয়েরালিওন আর এভাবে অনেক আফ্রিকান দেশ রয়েছে। ইউরোপের দেশও এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত এমনকি রাশিয়াও অন্তর্ভুক্ত।

হুযূর (আই.) বলেন, মেসিডোনিয়ান সিটিতে বাইতুল আহাদ নামে প্রথম আহমদীয়া মিশন হাউজ তৈরি সম্পন্ন হয়েছে। কাদিয়ান থেকে একটি ইট আনানো হয়েছিল যা দিয়ে এর ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয় এবং আমি সেখানে দোয়া করেছিলাম। এটি ৩তলা ভবন যেখানে একটি নামায ঘর, অযুখানা, স্টোর রুম, রান্নাঘর এবং আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। দ্বিতীয় তলায় মসজিদ যেখানে পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। তৃতীয় তলায় মুরুব্বীর কোয়ার্টার এবং বিভিন্ন অফিস আছে। এটি অনেক সুন্দর একটি ভবন।

রাকীম প্রেস

রাকীম প্রেসের মাধ্যমে অনেক বইপুস্তক ছাপানোর কাজ চলছে। বিশেষত, আফ্রিকার দেশগুলোতে বিভিন্ন বইপুস্তক ছাপিয়ে সরবরাহ করা হচ্ছে। ফার্ণহাম-এ অবস্থিত এই প্রেসের মাধ্যমে গেল বছর ৩ লাখ ১৫ হাজার পুস্তক ছাপা হয়েছে। এছাড়া এ সংখ্যার বাইরে বিভিন্ন লিফলেট ও প্যাম্ফলেটও ছাপা হয়েছে।

ওকালাতে তাসনীফ

- ইটালিয়ান ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে রিভিশন চলছে। ইটালিয়ান আহমদীয়া জামা'ত এজন্য অনেক পরিশ্রম করেছে। এছাড়া আরও বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদের কাজ হচ্ছে।
- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ৪টি বই ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে। ২৩ খণ্ডের রূহানী খাযায়েন অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রিন্ট করা হয়েছে। স্বল্পমূল্যে খুব চমৎকারভাবে তৈরি করা হয়েছে এটি। আপনারা এখান থেকে এগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। মলফুযাত ৩য় খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক পড়ার বিষয়ে অনেক ঘটনা রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মোবাল্লেগ লিখেছেন, অস্ট্রেলিয়াতে এক যুবক 'ইসলামী নীতি দর্শন' পুস্তক নিয়ে পড়েছে। সে বলে, এটি অসাধারণ একটি বই। নৈতিকতা সম্বন্ধে এখানে এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা আমাকে এককথায় বিমোহিত করেছে। সে একদিনে এটি পড়ে শেষ করে ফেলেছে কিন্তু তারপরও কিছু বিষয় তার এত ভাল লেগেছে যে, আবার এটি পড়ছে। সে বলেছে, এই বইটি আমাকে একজন ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে।

- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর পুস্তক অনুবাদ হচ্ছে। এ বছর ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ্।
- ওসমান চীনি সাহেবের জীবনীর আলোকে একটি পুস্তক ছাপানো হয়েছে।

ওকালাতে ইশায়াত

সর্বমোট ৯২টি দেশের রিপোর্ট অনুযায়ী ৩৮৪টি বইপুস্তক এবং প্যাম্ফলেট মোট ৩৯টি ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে যার সংখ্যা প্রায় ৩৬ লক্ষ ৮৮ হাজার। এর মাঝে আরবী, বাংলা, জার্মান, ইন্দোনেশিয়ান, বসনিয়ান, লুথেনিয়ান, সোহেলীসহ অনেক ভাষা অন্তর্ভুক্ত।

ওকালাতে ইশায়াত তারসীল

এ বিভাগের মূল কাজ হল, বিভিন্ন দেশে বইপুস্তক প্রেরণ করা। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে যেসব পুস্তক প্রেরণ করা হয়েছে তার সংখ্যা ৭৫,৭৪৫টি। এছাড়া আরও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা তারা পাঠিয়েছে। সর্বমোট ৯০টি দেশে ৫৯১টি লাইব্রেরী এবং আঞ্চলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেখানে লণ্ডন ও কাদিয়ান থেকে বই প্রেরণ করা হয়েছে। আর কাদিয়ান থেকেও অনেক বইপুস্তক ছাপানো হয়েছে।

প্রদর্শনী, বুকস্টল এবং বইমেলা

রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৭০টি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় যেখানে পৌনে দুই লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করে। সারাবিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ২৭৪৭টি বইমেলা কিংবা বুকস্টলে অংশগ্রহণ করে।

ভারতের একটি ঐতিহ্যবাহী বইমেলা যেখানে একজন নেপালী যিনি ইসলাম ধর্মকে একটি অসার ধর্ম বলে মনে করতেন। তিনি বইমেলায় এসে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেছেন তাতে তার ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে যায় এবং তিনি বলেন, ইসলাম ধর্ম সত্যিই একটি শান্তিপ্রিয় ধর্ম। আর এই সত্যিকার শিক্ষা অন্যদের মাঝেও প্রচার করা প্রয়োজন যাতে তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারে। একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই ইসলামের এই অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষামালা প্রচার করে আসছে।

লিফলেট বিতরণ

১০৩টি দেশে সর্বমোট ৬৯ লক্ষ ৮০ হাজার লিফলেট বিলি করা হয়েছে। এর

মাধ্যমে ১ কোটি ৬৮ লক্ষের অধিক মানুষের কাছে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। জার্মানি এক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এরপর যথাক্রমে ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি।

তানজানিয়ার একজন মুরব্বী সাহেব লিখেন, সেখানকার একটি গ্রামে অনেক বিরুদ্ধবাদী ছিল যার ফলে সেখানে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানো কঠিন ছিল। আমরা সেখানে যাই এবং জামা'তের নতুন লিফলেট প্রচার করি। পরের দিন সেখানকার এক ব্যক্তি আমাদেরকে তাদের গ্রামে আসার আহ্বান জানান এবং আহমদীয়াত সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান। সুতরাং আমরা সেখানে যাই আর তবলীগ করি যার ফলোশ্রুতিতে ৫ জন আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে যেখানে আমরা তবলীগ করা কঠিন মনে করতাম সেখানেই লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে ৫ জনের বয়আত পাই।

সেন্ট্রাল ডেস্কসমূহ

- **আরবী ডেস্ক–** ছোট বড় ১৩টি বই প্রিন্টের জন্য পাঠিয়েছে। ১৬৬টি লিফলেট তারা প্রস্তুত করেছে। রূহানী খাযায়েনের ২১ ও ২৩তম খণ্ড, বারাহীনে আহমদীয়া-৫ম খণ্ড, চশমায়ে মারেফাত, পয়গামে সুলহ, তফসীরে কবীর-১ম খণ্ড, তকদীরে ইলাহী, ইরফানে ইলাহী, বারাকাতে খিলাফত ইত্যাদি ছাপানো হচ্ছে।
- **রাশিয়ান ডেস্ক–** বিগত ১১ বছর যাবত রাশিয়ান ডেস্ক-এর মাধ্যমে রাশিয়ান ভাষায় জুমুআর খুতবা অনুবাদ হচ্ছে। তারা এগুলো অনুবাদ করে আল ফযলে ছাপানোর জন্যও পাঠিয়ে থাকে। এছাড়া আরও প্রবন্ধ ছাপিয়ে রাশিয়াতে সরবরাহ করে থাকে।
- **ফ্রেঞ্চ ডেস্ক–** তারাও জুমুআর খুতবা অনুবাদ করে থাকে। পাশাপাশি অন্যান্য প্রবন্ধও অনুবাদ করে। এছাড়া ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজেও তারা সহযোগিতা করছে।
- **বাংলা ডেস্ক–** MTA-তে ৪১ ঘণ্টা বাংলা লাইভ প্রোগ্রাম 'সত্যের সন্ধানে' সম্প্রচার করা হয়েছে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলায় ৭৮টি বয়আত লাভ হয়েছে। এমনিভাবে জুমুআর খুতবার অনুবাদও তারা করে থাকে এবং বিভিন্ন লিটারেচার অনুবাদেও তারা সাহায্য করছে।
- **চীনি ডেস্ক–** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পুস্তক 'ইসলাম আওর আসরে হাযের কে মাসায়েল'-এর অনুবাদ চীনা ভাষায় করিয়েছে। হযরত মির্যা বশির আহমদ (রা.)-এর 'হামারা খোদা' পুস্তকের অনুবাদও তারা করেছে। খলীফা সানী (রা.)-এর 'সীরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)' পুস্তকের অনুবাদ শেষের দিকে। ইনশাআল্লাহ্ খুব শীঘ্রই তা ছাপা হবে।
- **ইন্দোনেশিয়ান ডেস্ক–** মলফুযাত-১ম খণ্ড তারা অনুবাদ করেছে। জুমুআর খুতবা ছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধের অনুবাদও তারা করে থাকে।
- **টার্কিশ ডেস্ক–** পয়গামে সুলহ, সিতারায়ে কায়সারিয়া, তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রিভিউ মুবাহেসা বাটলভী অওর চাকড়ালোভী, তোহফায়ে কায়সারিয়া ইত্যাদি পুস্তক তারা অনুবাদ করেছে। একইভাবে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর পুস্তক ইসলাম মে ইখতেলাফাত কা আগায, হাকীকাতুর রুইয়া, তাকদীরে ইলাহী, মালায়েকাতুল্লাহ প্রভৃতি অনুবাদ করেছে এবং প্রকাশও হয়েছে।
- **সোহায়লী ডেস্ক–** MTA আফ্রিকার সমস্ত প্রোগ্রাম সোহায়লী ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে। এছাড়া সোহায়লী ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ রেকর্ড করার কাজ চলছে। অন্যান্য প্রবন্ধও অনুবাদ করছে।
- **স্প্যানিশ ডেস্ক–** তারা জুমুআর খুতবার পাশাপাশি অন্যান্য প্রবন্ধও অনুবাদ করছে। এছাড়া বিভিন্ন বইপুস্তক অনুবাদ করছে যার কিছু দ্বিতীয়বার প্রুফ চলছে। এবছর ইনশাআল্লাহ্ প্রকাশিত হবে। সেগুলোর মধ্যে আছে মায়ারুল মাযহাব, তোহফায়ে কায়সারিয়া, সাচ্চাঈ কা ইযহার, তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া প্রভৃতি।

প্রেস ও মিডিয়া

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তারা খুবই ভাল কাজ করেছে। প্রেস ও মিডিয়া অফিস ১০২টি খবর ও আর্টিকেল ছেপেছে। খুবই সাবধানতা অবলম্বনের মাধ্যমে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, ২ কোটির অধিক লোকের কাছে তাদের এই সংবাদ পৌঁছেছে। এছাড়া টেলিভিশনের মাধ্যমেও তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখিয়েছে এবং বহু সাংবাদিকের সাথেও এবছর সাক্ষাত হয়েছে।

আল ইসলাম ওয়েবসাইট
(alislam.org)

আল ইসলাম ওয়েবসাইট কুরআন বিষয়ক নতুন সার্চ ইঞ্জিন তৈরি করেছে।

দ্বিতীয় ভার্সনটি এই জলসার মাধ্যমে উদ্বোধন হচ্ছে। এছাড়া কুরআন পাঠের নতুন এ্যপলিকেশন (Read Quran.app) তৈরি করা হয়েছে। অসাধারণ অনেক বইপুস্তক এই ওয়েবসাইটে আছে। ইংরেজীতে ৩১৬টি এবং উর্দূতে ১০০০ পুস্তক ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। ইংরেজীতে নতুন ৬টি পুস্তক এমাজন, গুগল এবং এ্যাপেলে আপলোড করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭১টি পুস্তক এই প্লাটফর্মে আপলোড হয়েছে। ইংরেজীতে ৪০টি আর উর্দূতে ৭৭টি পুস্তকের অডিও ফাইল প্রস্তুত হয়ে গেছে। জুমুআর খুতবা-ও অনুবাদ করা হয়।

MTA ইন্টারন্যাশনাল

আল্লাহ্‌র কৃপায় ৮টি চ্যানেল ২৪ ঘণ্টা ইসলাম প্রচার করে চলেছে যেখানে অনেক স্বেচ্ছাসেবক কাজ করছেন। ১৭টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সরাসরি অনুবাদ করা হচ্ছে। যার মাঝে ইংরেজী, আরবী, ফ্রান্স, জার্মানি, বাংলা, সোহেলী, আফ্রিকান, ইংরেজী, ইন্দোনেশিয়ান, তুর্কী, বুলগেরিয়ান, বসনিয়ান, মালায়েআলাম, রুশি, পোস্ত ইতাদি ভাষা অন্তর্ভুক্ত।

- ঘানা MTA-ও ১৫ জানুয়ারী ডিজিটাল চ্যানেল চালু করেছে। এন্টেনার মাধ্যমে তা দেখা হয়। বিভিন্নটিভি চ্যানেল MTA'র প্রোগ্রামগুলো নিয়ে তাদের চ্যানেলে প্রচার করছে।
- MTA আফ্রিকা ২টি চ্যানেল সার্বক্ষণিক প্রোগ্রাম প্রচার করে চলেছে। সেখানে মোট ১১টি শাখা রয়েছে। ওয়াহ্‌হাব আদম স্টুডিও এবছর আরও উন্নত করা হয়েছে এবং গ্যাম্বিয়া স্টুডিও থেকেও ভাল কাজের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। MTA দেখার মাধ্যমেও অনেক মানুষ আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ- ক্যামেরুনের মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন, ক্যামেরুনের রাজধানী থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরের একটি ছোট শহরের এক ব্যক্তি আহমদী হয়েছিলেন। তিনি জানান, অনেক বছর যাবত তিনি ইউটিউবের মাধ্যমে MTA দেখেন এবং নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করেন। সে খুব ভালভাবেই বুঝে গিয়েছে যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) হলেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী। তার এক আত্মীয় যিনি আইভেরিকোষ্টে বসবাস করতেন তিনি আহমদীয়া মোবাল্লেগের ফোন নম্বর যোগাড় করেন এবং বর্তমানে তিনি তার পরিবারসহ আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আর জুমুআর খুতবা নিয়মিত দেখেন।

রেডিও স্টেশনসমূহ

এ মুহূর্তে জামা'তের রেডিও স্টেশনের সংখ্যা ২৭টি। মালিতে ১৭টি, বুর্কিনাফাসুতে ৪টি, সিয়েরালিওনে ৩টি এবং আরও কয়েকটি দেশে ১টি কিংবা ২টি হবে। এগুলোর মাধ্যমে তবলীগের অনেক কাজ হচ্ছে। তুর্কীতে একটি ইন্টারনেট রেডিও স্টেশন চালু হয়েছে। তারাও খুব ভাল কাজ করছে। এবছর ৫,০৬৮টিটিভি প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১,৮৭৭ ঘণ্টার প্রোগ্রাম বিভিন্ন চ্যানেলে দেখানো হয়েছে। এছাড়া রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে ৪৭,৮০০ ঘণ্টা এবং ১০,৮৩২টি প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়েছে।টিভি আর রেডিওর মাধ্যমে প্রায় ৩৩ কোটি মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে গেছে।

এ সংক্রান্ত অনেক ঈমানবর্ধক ঘটনা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ– মালির একজন মোবাল্লেগ লিখেন, আমরা যখন আফ্রিকাতে আহমদীয়াত বিস্তার সম্পর্কে অ-আহমদীদের সাথে আলোচনা করি তখন তারা বলে, আফ্রিকার মানুষ যেহেতু অধিকাংশ অশিক্ষিত তাই তারা বেশি আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা, কেননা আমাদের অঞ্চলে কিছুদিন পূর্বে যাকারিয়া নামে একজন শিক্ষক আহমদী হন। তিনি ইংরেজী এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় বেশ দক্ষ। তার সাথে কথা বলে জানা যায়, তিনি বিগত ৭ বছর যাবত আহমদীয়া রেডিও শুনতে থাকেন এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদীয়াত সম্পর্কে পড়ালেখা করেন। অবশেষে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন, বর্তমান যুগের একটি অকাট্য সত্যের নাম হল, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত।

ওয়াকফে নও

পৃথিবীতে ওয়াকফে নও ৭৫,৫২২ জন। এর মাঝে ৪৪,৬৯৭ জন ছেলে এবং ৩০,৮২৫ জন মেয়ে। ২,৮৫৬ জন এ বছর নতুন শামিল হয়েছেন। ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে ওয়াকফে নও-এর সংখ্যা ৩৪,৬২২ জন। এর মাঝে ছেলের সংখ্যা প্রায় ২২ হাজার এবং মেয়ে প্রায় ১২ হাজার। পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি, তারপর জার্মানি, ইউকে, ইন্ডিয়া এবং কানাডা।

মাখযানে তাসাভীর

তারা খুব ভালভাবে জামা'তের বিভিন্ন ছবিসমূহ সংরক্ষণ করে থাকেন এবং অত্যন্ত সুনিপুণভাবেই একাজ করছেন।

রিভিউ অব রিলিজিওনস

রিভিউ অব রিলিজিওন-এর ১১৯তম বছর চলছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এটি চালু করেছিলেন। এটি প্রতি মাসে ইংরেজীতে, দুই মাস পরপর জার্মান ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় এবং তিন মাস পরপর স্প্যানিশ ভাষায় ছাপা হয়। মোট ৪টি ভাষায় প্রতি বছর প্রায় ১,৯৭,০০০ কপি ছাপানো হয়। রিভিউ রিলিজিওন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ২ লক্ষ ৫০ হাজারের অধিক মানুষ এটি দেখে। ইন্সটাগ্রাম, ফেসবুক এবং টুইটারের মাধ্যমে এটি ৫০ লক্ষের কাছাকাছি

মানুষের নিকট পৌঁছায়। ইউটিউব চ্যানেলের ৮৭,০০০ সাবস্ক্রাইবার রয়েছে আর এবছর ২০ লক্ষের অধিক মানুষ এসব ভিডিও দেখেছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তারাও অনেক ভাল কাজ করছে। তারা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর ওপর বিভিন্ন বুকলেট প্রস্তুত করেছে। এছাড়া তারা 'দি গড সামিট' (The God Summit) নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে যা মানুষের মাঝে অনেক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং লোকেরা এ অনুষ্ঠান দেখে অভিভূত হয়েছে। যারা এটি দেখেছে তারা-ই অসাধারণ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তারা বলেছে, এখন আমরা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছি।

আল ফযল

২৭ মে ২০১৯ থেকে সপ্তাহে দুবার এটি প্রকাশ হচ্ছে। তারা আমার জুমুআর খুতবা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের ওপর আর্টিকেল ছেপে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তারা ভাল কাজ করছে। তারাও সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছাচ্ছে।

আল হাকাম

এটি সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে এটি সরবরাহ করা হচ্ছে এবং যুবক ইংরেজরা এ থেকে বেশি উপকৃত হচ্ছে। তারাও আল্লাহ্‌র ফযলে ভাল কাজ করছে। খুব ভাল ভাল প্রবন্ধ তারা ছেপে থাকে এবং পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্যাদিও এতে বিদ্যমান।

পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার

২০২০টি পত্র-পত্রিকায় সর্বমোট ৩,২৭৪টি আর্টিকেল তারা ছেপেছে। এর মাধ্যমে ৩০ কোটির অধিক লোকের কাছে বার্তা পৌঁছেছে।

আহমদীয়া আর্কাইভ এবং রিসার্চ সেন্টার (ARC)

আহমদীয়া আর্কাইভে এবং রিসার্চ সেন্টারে অনেক ভাল কাজ হচ্ছে। তারা হিস্টোরিকাল নেচার বিষয়ে কাজ করছে এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করছে। উদাহরণস্বরূপ- বিভিন্ন উপমহাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কিভাবে এসেছে এবং কাজ করছে– সে বিষয়ক নানা তথ্য-উপাত্ত তারা উপস্থাপন করে সে দেশের মানুষদের দেখাচ্ছে। হিন্দুস্তানে মুসলমানদের আগমন– এ বিষয়েও তারা গবেষণা করছে।

কেন্দ্রীয় আই.টি ডিপার্টমেন্ট

কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র-ও যথেষ্ট ভাল কাজ করছে। তারা বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য-প্রযুক্তি স্থাপনের কাজ সুচারুরূপে পালন করছে।

আন্তর্জাতিক আরবী-ইংরেজী অনুবাদ ডেস্ক

আন্তর্জাতিক আরবী-ইংরেজী অনুবাদ ডেস্ক ইংরেজী থেকে আরবীতে এবং আরবী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদের কাজ করছে। এরা খুব ভাল কাজ করছে। আরবী বইসমূহ ইংরেজীতে অনুবাদ হচ্ছে এবং ইংরেজীতে প্রকাশিত পুস্তকসমূহ আরবীতে, আর তারা এতে অনেক সাহায্য করছে।

এ.এম.জে (AMJ)

এই দপ্তরের অধীনে জামা'তের ইঞ্জিনিয়ার এবং আর্কিটেক্টরা বিভিন্ন মিশন হাউজে যাচ্ছে এবং সেখানকার কাজে সহযোগিতা প্রদান করছে। তারাও খুব ভাল কাজ করছে।

ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশান অব আহমদীয়া আরকিটেক্টস এন্ড ইঞ্জিনিয়ারস (IAAAE)

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তারাও খুব ভাল কাজ করছে। বিশেষত আফ্রিকায় তারা 'পানিই জীবন' এধরনের উদ্যোগের অধীনে বিভিন্ন স্থানেটিউবয়েল স্থাপন করছে। পাশাপাশি 'সৌর বিদ্যুৎ' সরবরাহের কাজেও যথেষ্ট সহায়তা করছেন। এছাড়া তারা আরও অনেক মানবসেবামূলক কাজের সাথে জড়িত আছে।

নুসরত জাহাঁ স্কিম

নুসরত জাহাঁ স্কিম খুব ভাল কাজ করছে। সর্বমোট ১২টি দেশে ৩৭টি হাসপাতাল ও ক্লিনিক এর অধীনে কাজ করছে। ঐসব স্থানে ৪৯ জন কেন্দ্রীয় এবং ১৪ জন স্থানীয় ডাক্তার সেবা প্রদান করছেন। এছাড়া ১১টি দেশে মোট ৫৯৩টি জুনিয়র স্কুল, হাইস্কুল বা সেকেন্ডারী স্কুল তারা পরিচালনা করছে যেখানে ২১ জন কেন্দ্রীয় শিক্ষক শিক্ষকতা করছেন।

মাসরূর আই ইনস্টিটিউট

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ইউকে, বুরকিনাফাসোঁতে মাসরূর আই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি অনেক সুন্দর একটি হাসপাতাল যা অচিরেই সম্পন্ন হবে। এর ব্যবস্থাপনা খুবই ভাল। খুব শীঘ্রই এটি উদ্বোধন করা হবে।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট

হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর পক্ষ থেকে বিরাট কাজ হচ্ছে। পৃথিবীর ৬০টি দেশে তারা রেজিষ্টার্ড হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তারা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী এবং জরুরী প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করে থাকে। ফ্রি চোখ পরীক্ষা করিয়ে থাকে। এছাড়া ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প-এর মত সেবামূলক কাজও তারা দরিদ্র দেশে গিয়ে করছে। তারা বিভিন্ন স্থানে রক্তপ্রদান কর্মসূচীসহ চক্ষুদান-এর মত মহৎ সেবাও করছে। তারা বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ খাবার পানিও সরবরাহ করছে। এছাড়া অধিকারবঞ্চিত

মানুষদের সেবা প্রদান করছে, এমনকি কয়েদীদেরও তারা চিকিৎসাসেবা প্রদান করছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এমন সেবামূলক কাজে আরও সামর্থ্য প্রদান করুন।

নও মোবাঈন

নও মোবাঈনের সাথে যোগাযোগ এবং তাদের প্রতিপালন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। একটি দীর্ঘ সময় যাবত তাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকলে এক পর্যায়ে গিয়ে তারা হারিয়ে যাবে। একাজের ক্ষেত্রে নাইজেরিয়া প্রথম। এরপর যথাক্রমে মালি, সিয়েরালিওন, সেনেগাল, ক্যামেরুন, আইভেরিকোষ্ট ইত্যাদি। সর্বমোট ৬,৭৬৫টি জামা'তে মোট ৩০,৭৫৫টি তরবিয়তী ক্লাস নেয়া হয়েছে যেখানে **১ লক্ষ ১৮ হাজার** নও মোবাঈন অংশগ্রহণ করেছে।

বয়আত

এ বছর যদিও আমরা কোভিড-১৯ মহামারির কারণে প্রকাশ্যে আহমদীয়াতের বাণী প্রচার করতে সক্ষম হই নি তারপরও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মোট **১ লক্ষ ২৫ হাজার ২২১টি** বয়আত হয়েছে। গত বছরের তুলনায় যা প্রায় ১৩ হাজার অধিক। বয়আতের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি বয়আত হয়েছে গিনি কোনাকরি-তে যাদের সংখ্যা ২৫ হাজারের অধিক। এরপর আছে ক্যামেরুন, সিয়েরালিওন, সেনেগাল, তানযানিয়া প্রভৃতি।

রাশিয়ার মুরব্বী সাহেব লিখেন, গতবছর আমরা একজন সুপরিচিত রাশিয়ান ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে সমর্থ হই। তিনি ব্যাপকভাবে আহমদীয়াত সম্পর্কে পড়ালেখা করেন যার ফলোশ্রুতিতে তিনি ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বয়আত গ্রহণ করেন। শুরুর দিকে আমরা তাকে বলতাম, আপনার দোয়া করা উচিত যাতে আপনি নিদর্শন লাভ করতে পারেন। তিনি বলেন, আমার কোন নিদর্শনের প্রয়োজন নেই। আমি হযরত আবু বকর (রা.)-এর মত সত্যকে জেনেছি এবং মেনেছি। তারপর সেই ব্যক্তি বয়আত গ্রহণ করেন।

মেক্সিকোর মোবাল্লেগ লিখেন, এক যুবক বেশ কয়েক বছর যাবত আহমদীয়াত সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছিল। তার মা পূর্বেই আহমদী হয়েছিল। একদিন তার সাথে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা ও কিছু প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পর হঠাৎ সে বলে, আমি আহমদী হব। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলে, আমি কয়েক বছর ধরে ইসলাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি। আসলে আমি নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলাম। যাহোক, ইসলাম আমার সকল সন্দেহ-সংশয় দূর করেছে। অতঃপর সে বয়আত গ্রহণ করে।

এরকম অসংখ্য ঘটনা বর্ণনার পর হুযূর (আই.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পাঠ করেন যা তিনি (আ.) বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন।

তিনি (আ.) বলেন, "সাবধান হয়ে যাও এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) প্রতাপকে ভয় কর আর নিশ্চিত জেনে নাও, তোমরা তোমাদের বিশৃঙ্খল অন্যায় আচরণেই পড়ে রইলে। খোদা যদি তোমাদের সাথে থাকতেন তাহলে এত ধোঁকাবাজি প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন হত না। একজন ব্যক্তির দোয়াই আমার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট হত। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কারও দোয়া ঊর্ধ্বলোকে গৃহীত হল না। বরং দোয়ার ফলাফল এটাই দাঁড়াল যে, তোমরাই দিনে দিনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছো। ..... তোমরা কি দেখছ না, দিনে দিনে তোমাদের সংখ্যাই কমছে আর আমরা বেড়েই চলেছি? তোমরা যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে তাহলে এই যুদ্ধের পরিণাম কি এমনটাই হবার ছিল?" *(নুযুলুল মসীহ্, রূহানী খাযায়েন, অষ্টাদশ খণ্ড:, পৃ: ৪০৯)*

আল্লাহ্ তা'লা এই বিরুদ্ধবাদীদের শুভবুদ্ধির উদয় ঘটান এবং সমগ্র বিশ্বকে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী বুঝার তৌফিক দান করুন।

ভাবানুবাদ: পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' ডেস্ক

"আহ্‌মদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহ্‌মদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিকনির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার সম্পাদক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **সম্পাদক, পাক্ষিক আহ্‌মদী,**
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশিবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

০৭ আগস্ট, ২০২১ যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে
জলসা সালানায় প্রদত্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর সমাপনী বক্তৃতা

বিষয়: ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের অধিকার

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ আমি বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের অধিকারের বিষয়ে বক্তব্য দেয়ার ক্ষেত্রে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখব যা গত ২০১৯ সালের জলসা সালানার শেষ অধিবেশনে শুরু করেছিলাম। উক্ত বিষয়ে গতকাল লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যকালেও আমি স্বল্প-বিস্তর উল্লেখ করেছিলাম অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম সকল শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আর এই সকল অধিকারের বিষয় কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে আমি বর্ণনা করব যেগুলোর ওপর আমল করার ফলে প্রকৃতঅর্থে বিভিন্ন শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আমরা ঈমান রাখি এবং বিশ্বাস করি যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা পরিপূর্ণ এবং সকল যুগের সমস্যার সমাধানস্বরূপ। কুরআন অনুযায়ী আমল করা ছাড়া না-ই জগতের সমস্যা সমাধান সম্ভব আর না-ই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব। তাই জগতের সম্মুখে এই শিক্ষাকে উপস্থাপন করার জন্য আমাদের কোনপ্রকার লজ্জা, সংশয় এবং হীনম্মন্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। অধিকারের বিষয়ে আমাদের জাগতিক লোকদের বানানো রীতিনীতি আত্মস্থ করার প্রয়োজন নেই আর না-ই কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আত্মস্থ করার প্রয়োজন আছে বরং পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে জগৎপূজারীদের এবং অধিকার সংরক্ষণকারী নামসর্বস্ব সংস্থাগুলোকে নিজেদের পেছনে চলার আহ্বান করার আবশ্যকতা রয়েছে। যেন সবদিক দিয়ে সকল শ্রেণির লোকের অধিকার সংরক্ষণ হয় আর পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সত্যিকার অর্থে সৃষ্টি হয় এবং প্রতিষ্ঠিত থাকে। একথা সুনিশ্চিত যে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ না এ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় যে, আমাদের সৃষ্টিকারী একজন স্রষ্টা আছেন এবং তাঁর অধিকার প্রদান করাও আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্‌র অধিকার কী? তা হল, আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তাঁর ইবাদাতে কাউকে শরীক না করা আর আল্লাহ্‌র স্মরণে লেগে থাকা। তাঁর আদেশ মান্য করা এবং নিষেধ করা বিষয়ে বিরত থাকা। আর আল্লাহ্ তা'লার বিষয়টি যখন উপলব্ধি করা হবে তখন তাঁর বিধিবিধানের ওপর আমল করার দিকেও মনোযোগ সৃষ্টি হবে। আর তাঁর বিধিবিধানের অনেক বড় অংশ তাঁর সৃষ্টির অধিকার প্রদান করা বিষয়ক। আল্লাহ্ তা'লা সেই সত্তা যিনি সকল শক্তির আধার, প্রভু, সবকিছু দানকারী, যাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা প্রত্যেক মানুষের জন্য আবশ্যকীয়। কেননা তিনি তাঁর রবুবিয়্যত, রহমানিয়্যত এবং রহিমিয়্যত-এর দৃশ্য প্রদর্শন করেন। মহানবী (সা.) বলেন, যদি তোমাদের সাথে কেউ সদাচরণ করে অথচ তোমরা যদি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না কর তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌রও কৃতজ্ঞ বান্দা নও। অতএব আল্লাহ্ তা'লা সব জায়গায় আমাদের বলেছেন যে, তোমরা একে অপরের অধিকার প্রদান কর, তবেই আমার অধিকার প্রদানকারী বলে সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যও বান্দার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজের অধিকারও বান্দার অধিকার প্রদানের সাথে শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন। অতএব এই হল ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা। আর এই হল ইসলামের খোদা, যিনি একে অপরের অধিকার এভাবে প্রতিষ্ঠা করার উপদেশ দেন। এখন আমি কতক অধিকারের

বিষয়ে উল্লেখ করব। পূর্বে আমি যে অধিকারের বিষয়টি বর্ণনা করে এসেছি সেখানে আল্লাহ্‌র অধিকারের কিছুটা উল্লেখের পাশাপাশি পিতা-মাতার অধিকার, সন্তানের অধিকার, ছেলেমেয়েদের অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, ভাইবোনের অধিকার, আত্মীয়স্বজনের অধিকার, প্রতিবেশির অধিকার, বিধবাদের অধিকার, বৃদ্ধদের অধিকার, শত্রুর অধিকার, দাস-দাসীর অধিকার, অমুসলিমদের অধিকার বিষয়ক উল্লেখ ছিল। এই অধিকারসমূহের দাবী কিছুটা এমন যে, জাগতিক লোকজন এর ধারেকাছেও আসতে পারে না। এখানেই কথা শেষ নয়, আমি যেভাবে পূর্বে বলে এসেছি, অধিকার বিষয়ক তালিকা আরও দীর্ঘ, যার মাঝ থেকে আমি আজ কিছুটা উল্লেখ করব, যেগুলো প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে ইসলাম ধর্ম নিজ অনুসারীদেরকে উপদেশ দিয়েছে তথা এ অধিকারসমূহ প্রদান কর তাহলে তোমরা নিজেকে প্রকৃত মু'মিন এবং প্রকৃত মুসলমান বলে পরিচয় দিতে পার। বরং আমরা যখন বিস্তারিত বিষয়ের দিকে যাই, তখন উপলব্ধি হয় যে, ইসলাম ধর্ম প্রাণীর অধিকারও সংরক্ষণ করে। আর কেবল আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি বরং ইসলামের অনুসারীরা সেই আদেশ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করেও দেখিয়েছে।

যাহোক, যে বিষয় বর্ণনা করার জন্য বা যে সকল শ্রেণির অধিকারের বিষয়টি আমি বেছে নিয়েছি তার মাঝে একটি হল, **বন্ধুর অধিকার প্রদান করা**। দেখুন, কী বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন যে, তোমাদের প্রকৃত বন্ধু সে-ই হতে পারে যার হৃদয় স্বচ্ছ বা পরিষ্কার। যদি হৃদয় স্বচ্ছ না হয় তাহলে কেমন বন্ধুত্ব হল! আর যাদের হৃদয় স্বচ্ছ তাদেরকে যখন বন্ধু বানাবে তখন তাদের অধিকারও প্রদান করবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۖۚ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ *(সূরা আলে ইমরান: ১১৯)*

অনুবাদ: হে যারা ঈমান এনেছ! নিজেদেরকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিও না। তারা তোমাদের ক্ষতি করতে কার্পণ্য করে না। তোমাদের কষ্টে নিপতিত হওয়া তাদের পছন্দনীয়। নিশ্চিতরূপে এ বিষয়টি তাদের মুখ থেকে প্রকাশ পেয়ে গেছে। আর যা তারা হৃদয়ে গোপন করে তা আরও ভয়াবহ। নিশ্চিতরূপে এই আয়াত আমরা তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি, হায়! যদি তোমরা বিবেক খাটাতে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বন্ধুদেরকে নিকটাত্মীয়ের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে ভ্রাতৃত্বের এমন পরিবেশ সৃষ্টি আদেশ প্রদান করেছেন যার নৈকট্যের প্রেরণাকে বৃদ্ধি করে। বন্ধুত্বের মান কেমন হওয়া উচিত? যখন এভাবে বন্ধুত্ব হয়ে যায় তখন তা প্রতিষ্ঠিত রাখাও আবশ্যক। এ বিষয়ে মহানবী (সা.) বলেন, হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র খাতিরে ভালবাসল, আর আল্লাহ্‌র খাতিরে ঘৃণা করল আর আল্লাহ্‌র খাতিরে কিছু দান করল অথবা আল্লাহ্‌র খাতিরে দান করা থেকে বিরত থাকল, তবে নিশ্চিতভাবে সে তার ঈমান পূর্ণ করল।

আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে বন্ধুত্বের দাবি পূর্ণ করতে হবে। এই বিষয়টিই প্রকৃত বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে আর রাখেও বটে। এমন অস্থায়ী বন্ধুত্ব কোন বন্ধুত্বই না যেখানে ফাঁটল সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসার উদ্দেশ্যে যে বন্ধুত্ব– তা স্থায়ী বন্ধুত্বই হয়ে থাকে। এক বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, নিশ্চিত আল্লাহ্‌র বান্দার মাঝে এমন অনেকে থাকবে যারা নবী বা শহীদ তো হবে না কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সমীপে নবী এবং শহীদরা তাদের মর্যাদায় ঈর্ষা করবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তারা কারা? তিনি (সা.) বললেন, যারা আল্লাহ্‌র খাতিরে ভালবাসবে, কেননা তাদের মাঝে না তো আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে আর না-ই কোন লেনদেনের বিষয় থাকবে। আল্লাহ্‌র কসম, তাদের চেহারা নূরান্বিত হবে এবং তাঁরা নূরে পরিপূর্ণ থাকবে। কেয়ামতের দিন মানুষ যখন ভীত থাকবে সেদিন না তাদের কোন ভয় থাকবে আর না-ই তারা চিন্তিত হবে।

অতএব এই হল পারস্পরিক ভালবাসা ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি করার প্রতিফলন এবং আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ।

এরপর আবু দারদা বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, যে মুসলমানই নিজ ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করে তখন ফিরিশতা তার পক্ষে দোয়া করে বলে, তোমার জন্যও তাই হোক। এখানে কেবল আপন ভাইয়ের কথা বলা হয় নি, নিজ ভাইয়ের জন্য সাধারণত দোয়া করা হয়। এই ভ্রাতৃত্ববোধে অনাত্মীয় এবং বন্ধুও অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম এমন ভালবাসার ভিত্তি রেখেছে, যার কোন উপমা পাওয়া যায় না, যা একে অপরের জন্য দোয়া করার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর ফিরিশতার দোয়া লাভেরও মাধ্যম হয়ে যায়।

এরপর হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ রেখ না, আর হিংসাও কর না আর না-ই পরস্পর গীবত করবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলমানের জন্য নিজ ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা বৈধ নয়।

অতএব এই হল ভাই ও বন্ধুর অধিকার প্রদান করা।

হযরত আবু উসায়েদ মালেক বিন রাবিয়্যা সা'দী বর্ণনা করেন যে, আমরা মহানবী (সা.)-এর পাশে উপবিষ্ট ছিলাম। বনু সালমা গোত্র থেকে এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)!

আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদের জন্য পুণ্যকর্ম করার কোন সুযোগ আছে? তিনি (সা.) বললেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করা। তাদের মৃত্যুর পূর্বে তাদের দ্বারা কৃত অঙ্গীকার তাদের মৃত্যুর পর পূর্ণ করা আর সেই সকল আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা– যাদের সাথে কেবল তাদের কারণেই আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা হত এবং তাদের বন্ধুদের সাথে সদাচরণ করা।

এখানে কেবল স্বজাতীয় বন্ধুর কথা বলা হয় নি বরং সার্বজনীন বন্ধুর কথা বলা হয়েছে। এই হল বন্ধুদের অধিকার প্রদান করা অর্থাৎ পিতা-মাতার বন্ধুদের অধিকারও তোমরা প্রদান করবে।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, সবচেয়ে বড় পুণ্য হল, মানুষ যেন তার পিতার খাতিরে সুসম্পর্ক বজায় রাখে যদিও তার পিতা মৃত্যুবরণ করুক না কেন।

বংশ পরম্পরায় এই বন্ধুত্বের অধিকার প্রদানের বিষয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, প্রকৃত বিষয় হল, আমাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের সম্পর্ক একটি দেহের ন্যায়। এ বিষয়টি আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাই যে, একটি সামান্য অঙ্গে বরং একটি আঙুলেও যদি ব্যথা অনুভূত হয় তাহলে সমস্ত দেহ অস্থির হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা খুব ভালভাবে জানেন যে, ঠিক এভাবেই সর্বদা এবং প্রতিটি মুহূর্তে আমি এই চিন্তায় মগ্ন থাকি যে, আমার বন্ধুরা যেন সব ধরনের স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, এই সহানুভূতি আর এই দুশ্চিন্তা কোন লৌকিকতা এবং অসৎ উদ্দেশ্যে নয় বরং এক মা যেভাবে তার সন্তানদের মাঝে প্রত্যেক সন্তানের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় মগ্ন থাকে, সন্তান যতজনই হোক না কেন, ঠিক সেভাবেই কেবল আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে আমার বন্ধুদের জন্য নিজ হৃদয়ে জ্বলন ও দুশ্চিন্তা অনুভব করি। আর এই সহানুভূতি কিছুটা এমন মর্মবেদনার অবস্থায় হয়েছে যে, আমাদের বন্ধুদের পক্ষ থেকে কারও দুঃখকষ্ট বা অসুস্থতা-সম্বলিত পত্র আসে তখন আমার ভিতরে এক অস্থিরতা এবং শঙ্কা সৃষ্টি হয় এবং মর্মপীড়া অনুভূত হয় আর যতই আমার বন্ধুর সংখ্যা বাড়ছে, ততই এই মর্মপীড়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন একটি মুহূর্ত এমন যায় না যখন আমি কোন ধরনের দুশ্চিন্তা এবং বেদনা অনুভব না করি। কেননা এত অধিক সংখ্যায় বন্ধুর মাঝ থেকে কেউ না কেউ যে কোন ধরনের দুঃখকষ্টে নিপতিত হয়-ই। আর সেই খবর জানার পর আমার হৃদয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। কতটা সময় দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে পার করি- আমি তা বলে বুঝাতে পারব না, কেননা আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কোন সত্তা এমন নেই, যে এমন দুঃখকষ্ট এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে পারে। তাই আমি সদা দোয়ায় রত থাকি আর আমার সবচেয়ে অগ্রগণ্য দোয়া হল, আল্লাহ্ যেন আমার বন্ধুদেরকে দুঃখকষ্ট এবং দুশ্চিন্তা থেকে সুরক্ষা করেন। কেননা তাদের দুঃখকষ্ট আমাকে মর্মপীড়ায় নিপতিত করে। আর এই দোয়া সর্বান্তকরণে করা হয় যে, যদি কেউ দুঃখকষ্টে নিপতিত হয় তবে আল্লাহ্ যেন তাকে পরিত্রাণ দান করেন। সর্বান্তকরণে এবং পরিপূর্ণ আবেগের সাথে এই মানস তৈরি হয় যে, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি কেননা দোয়া কবুলিয়্যতের ফলে বড় বড় ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।

এ কথাগুলোতো জামা'তের সদস্যদের বিষয়ে তিনি (আ.) বলেছেন। নিজ বন্ধুদের বিষয়ে তিনি (আ.) আরও বলেন, বন্ধুদের সাথে আমাদের সম্পর্ক এতই গভীর যে, বন্ধুদের পরিবার-পরিজন যেন আমাদেরই পরিবার-পরিজন। এই সকল প্রিয়জনদের কারো বিয়োগে আমি এতটাই দুঃখ পাই যতটা কেউ তার প্রিয় সন্তানের মৃত্যুতে দুঃখ পায়।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বন্ধুত্বের মান কেমন হওয়া উচিত- এ বিষয়টি উপমা দিয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "চুরি একটি মন্দ অভ্যাস। কিন্তু বন্ধুর জিনিস যদি অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা হয় তবে তা দোষের নয়। [সর্বসাধারণের মাঝে এটি দেখা যায় তবে অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়া আবশ্যক, যদি অটুট বন্ধুত্ব থাকে তাহলে বন্ধুর অনুমতি ছাড়া কোন জিনিস যদি ব্যবহার করা হয় বা বের করে নেয়া হয় তাহলে এতে দোষের কিছু নেই, এটি চুরি নয়]। তিনি (আ.) বলেন, একদা দুই বন্ধুর মাঝে গভীর বন্ধুত্ব ছিল (ঘটনা বর্ণনা করছেন) এবং একে অপরের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। ঘটনাক্রমে এক বন্ধু সফরে যায়। অপরজন বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার ঘরে আসে এবং দাসীর কাছে জিজ্ঞেস করে, আমার বন্ধু কোথায়? সে বলে যে, সফরে গিয়েছে। বন্ধু সেই দাসীকে জিজ্ঞেস করে, তার টাকা রাখা সিন্দুকের চাবি কি তোমার কাছে? সে বলে, হ্যাঁ, আমার কাছে আছে। সেই বন্ধু দাসীকে দিয়ে সিন্দুক আনিয়ে নিল এবং তার কাছ থেকে চাবি নিল এবং সিন্দুক থেকে কিছু টাকা নিয়ে নিল। বাড়ির মালিক বন্ধু যখন ফেরত আসল, তখন দাসী বলল, আপনার বন্ধু ঘরে এসেছিল। একথা শুনে বাড়ির মালিকের চেহারা ফিকে হয়ে গেল এবং জানতে চাইল, বন্ধু এসে কী বলেছে? দাসী বলল, সে এসে আমার কাছ থেকে সিন্দুক আর চাবি নিয়ে আপনার টাকার সিন্দুক থেকে কিছু টাকা নিয়ে গেছে। ঘরের মালিক উক্ত দাসীর প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হল, কারণ সে তার বন্ধুর কথামত কাজ করেছে, তাকে অসন্তুষ্ট করে নি, বন্ধুকে বিফলমনোরথ ফেরত পাঠায় নি। সন্তুষ্ট হয়ে সেই দাসীকে সে স্বাধীন করে দিয়ে বলল, তুমি আজ যে পুণ্যকর্ম করেছ, এর প্রতিদানে আমি তোমাকে আজই স্বাধীন করে দিচ্ছি।"

অতএব এমন বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের দাবি পূর্ণ করা আবশ্যক। বন্ধুর অধিকারের বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কত চমৎকারভাবে বলেন, আমার বিশ্বাস হল, যে ব্যক্তি আমার সাথে একবার বন্ধুত্বের বন্ধন রচনা করে, সেই বন্ধুত্ব রক্ষা করা আমার জন্য এতটাই বাধ্যতামূলক হয়ে যায় যে, সে যা-ই হোক আর যেমনি হোক না কেন, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারি না। তবে হ্যাঁ, সে যদি নিজ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে সেক্ষেত্রে

আমি নিরুপায়। অন্যথায় আমার ধর্ম হল, আমার বন্ধুদের মাঝে কেউ যদি মদ পান করে এবং বাজারে পড়ে থাকে আর লোকেরা ভিড় করে তাকে ঘিরে থাকে সেক্ষেত্রে নিন্দুকের নিন্দার ভয় না করে আমি তাকে তুলে নিয়ে আসব। বন্ধুত্বের বাঁধন খুব মুল্যবান সম্পদ। সহজে তা বিনষ্ট করা উচিত নয়। আর বন্ধুর মুখ থেকে যে অশোভনীয় কথাই কানে আসুক না কেন তা চোখ-কান বন্ধ করে উপেক্ষা করা উচিত। অচেনা মানুষ তো এমন কথা বলবে না, এখানে বন্ধুবান্ধবের কথা বলা হচ্ছে।

এই হল বন্ধুর অধিকারের মান। একবার বন্ধু বলে সম্বোধন করেছেন তো জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেই সম্বন্ধ অটুট রাখবেন। মহানবী (সা.)ও বলেছেন যে, সন্তানদের দায়িত্ব হল, নিজ পিতা-মাতার বন্ধুদের সাথেও সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের অধিকার প্রদান করবে- এ বিষয়টি আমি আগেও বলেছি।

ইসলাম ধর্ম রোযা রাখা বিধিবদ্ধ করেছে তবে **অসুস্থ ব্যক্তিদের অধিকার প্রদান করেছে**। যদি কেউ অসুস্থ থাকে তাহলে রোযা রাখার ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে, যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ *(সূরা আল বাকারা: ১৮৫)*

অর্থ: গণনার কয়েকটি দিন মাত্র। কিন্তু তোমাদের মাঝে যে-ই অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তাদের জন্য আবশ্যক হল, তারা অন্য সময়ে এই রোযা পূর্ণ করবে।

অতএব ইসলাম ধর্ম অসুস্থ ব্যক্তির অধিকার প্রদান করেছে তথা তার জন্য ছাড় দিয়েছে। অসুস্থ ব্যক্তিকে রোযা রাখতে বাধ্য করে নি। রোযার ক্ষেত্রে অনেকে নিজের ওপর বোঝা চাপিয়ে নেয়, এটি তাদের অন্যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, তাই তোমরা যদি সফরে অথবা অসুস্থাবস্থায় রোযা রেখে নাও তবুও পরবর্তীতে তোমাদের সেই রোযা পূর্ণ করতে হবে। এছাড়া সমাজে অসুস্থ ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি রয়েছে, তাদের ছোট ছোট মনোবাঞ্ছা থাকে, সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করারও আদেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) একবার এক রোগীকে দেখতে গেলেন। তিনি (সা.) বললেন, তুমি কী চাও? সেই অসুস্থ ব্যক্তি বলে, আমি গমের রুটি খেতে চাই। [এই হল তৎকালীন সাহাবীদের অবস্থা, গমের রুটিও তাদের জন্য সহজলভ্য ছিল না, গমের রুটি যেন খেতে পারি- এতটুকুই আকাঙ্ক্ষা ছিল] তখন মহানবী (সা.) এলান করলেন যে, যার কাছে গমের রুটি আছে সে যেন তার এই ভাইয়ের কাছে তা পৌঁছে দেয়। [এটি সাধারণ জিনিস ছিল না যে, সব ঘরেই থাকবে, তাই বললেন, যার কাছে আছে সে যেন তার ইচ্ছা পূর্ণ করে] এরপর তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের কাছে কোন অসুস্থ ব্যক্তি যদি কিছু খেতে চায় তবে তাকে তা খাওয়াও।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন: কোন ব্যক্তি যখন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় তখন ঊর্ধ্বলোক থেকে একজন ঘোষণাকারী বলে ওঠে, তুমি খুব ভাল মানুষ, তোমার চালচলন খুব ভাল আর তুমি জান্নাতে নিজের ঘর নির্মাণ করে ফেললে।

অতএব অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে আল্লাহ্ তা'লা এভাবে পুরস্কৃত করেন। এছাড়া অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দোয়া করাও অসুস্থ ব্যক্তির অধিকারের মাঝে পড়ে। এ ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ কী ছিল? হযরত আয়েশা বিনতে সা'দ বর্ণনা করেন, তার পিতা সা'দ (রা.) বলেন, "একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং তখন আমি মক্কায় অবস্থান করছিলাম। মহানবী (সা.) আমাকে দেখতে এলেন। তিনি (সা.) তাঁর পবিত্র হাত আমার কপালে রাখলেন, এরপর আমার বুকে ও পেটে হাত বুলালেন আর দোয়া করে বললেন, হে আমার আল্লাহ্! সা'দকে তুমি আরোগ্য দান কর এবং তার হিজরতকে পূর্ণতা দান কর" মহানবী (সা.) তার দীর্ঘায়ু লাভের দোয়া করেছেন।

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এবং তার অধিকার প্রদান করা কত বড় প্রতিদান লাভের কারণ হয়, এ বিষয়ে হযরত আলী (রা.) বলেন, "আমি মহানবী (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছি, যে নিজ অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখতে গেল, সে জান্নাতের ফল আহরণের মৌসুমে বাগানের মাঝে ততক্ষণ বিচরণ করবে যতক্ষণ সে না বসে। এরপর যখন সে বসে পড়ে তখন রহমত তাকে পরিবেষ্টন করে রাখে। যদি প্রভাতকাল হয় তাহলে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার প্রতি রহমত প্রেরণ করে, আর যদি সন্ধ্যাকালীন সময় আর সে রোগী দেখতে যায় তাহলে সকাল হওয়া পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার প্রতি রহমত প্রেরণ করে।"

অতএব অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার এই হল প্রতিদান। এরপর রোগী দেখতে গেলে কী করতে হবে, এ বিষয়ে আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, রোগী দেখার পরিপূর্ণ পদ্ধতি হল, তোমাদের মাঝে যে তাকে দেখতে যাবে সে তার হাত রোগীর কপালে রাখবে [পূর্বের হাদীসেও এরূপই বলা হয়েছে] এরপর তার হাতে হাত রাখবে এবং তার কুশল জিজ্ঞেস করবে। এরপর তোমাদের উভয়ের হাত মেলানো তোমার পক্ষ থেকে এক পরিপূর্ণ উপঢৌকনস্বরূপ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রোগীদের অধিকার কিভাবে প্রদান করতেন এ সম্পর্কিত একটি রেওয়ায়াত রয়েছে, "এক কোরাইশী সাহেব একবার বেশ কিছুদিন ধরে দারুল আমান-এ অসুস্থাবস্থায় ছিলেন আর হুযূরের কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। তিনি অনেকবার হুযূরের কাছে দোয়ার অনুরোধ করেন আর মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, আমি দোয়া

করব। একদিন সন্ধ্যার সময় হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর মাধ্যমে তিনি নিবেদন করেন যে, আমি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দেখার সৌভাগ্য লাভ করতে চাই কিন্তু পা ফুলে থাকার কারণে আমি তার কাছে নিজে যেতে পারছি না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এটি শুনে পরেরদিন নিজেই তার ঘরে গিয়ে তাকে দেখার প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য তিনি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েই খোদ্দামদের সাথে নিয়ে তার ঘরে যান, যেখানে অতিথি অপেক্ষা করছিলেন এবং তিনি অনেকক্ষণ পাশে বসে রোগীর খবরাখবর নেন।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) সাহেব বলেন, রোগীকে দেখার জন্য হুযূর অনেক সময় সফর করেছেন। লুধিয়ানায় মীর আব্বাস আলী সূফী সাহেব নামের এক ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমদিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সঙ্গে তার অনেক সুসম্পর্ক ছিল। তার অসুস্থ হবার চিঠি পেয়ে তিনি (আ.) নিজে অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও এবং অনেক ব্যস্ততা সত্ত্বেও বন্ধুত্বের দাবির প্রতি এতটা যত্নবান ছিলেন যে, তাকে দেখার জন্য লুধিয়ানায় যাওয়া আবশ্যক মনে করেন। এরপরে মুফতি সাহেব লিখছেন যে, ১৮৮৪ সনের ১৪ই অক্টোবর হুযূর (আ.) লুধিয়ানায় মীর সাহেবকে দেখার জন্য যান এবং তার খবরাখবর নিয়ে আবার ফেরত চলে আসেন। আল্লাহ্‌র ফযলে মীর সাহেব সুস্থ হয়ে যান।

এরপরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রোগী ও অসুস্থ লোকদের প্রাপ্য কতটা সতর্কতার সাথে প্রদান করেন এ সম্পর্কে মৌলভী আব্দুল কারীম শিয়ালকোঠী সাহেব লিখেছেন যে, অনেক সময় ঔষধ নিতে আসা মহিলারা দরজায় অনেক জোরে কড়া নাড়াত আর উচ্চস্বরে হুযূরকে বলত, মির্জা সাহেব দরজা খুলুন। মসীহ্ মাওউদ (আ.) এমনভাবে ছুটে আসতেন যেভাবে কোন দাস মনিবের ডাকে সাড়া দেয়। আর তিনি হাসিমুখে তাদেরকে সাথে কথা বলতেন এবং তাদের ঔষধ প্রদান করতেন। তিনি লিখেন, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও সময়ের মূল্য বোঝে না। আর যারা গ্রাম্য মানুষ তারা তো বেশি সময় নষ্ট করে থাকে। এক মহিলা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে অনর্থক কথা বলা আরম্ভ করে দেয়। ঘরের এবং সাংসারিক সমস্যার কথা বলতে থাকে। তার শাশুড়ি-ননদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলতে থাকে– এতে হুযূরের অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মসীহ্ মাওউদ (আ.) ধৈর্যের সঙ্গে তাদের কথা শুনতে থাকেন এবং ইশারা-ইঙ্গিতেও এটি বলতেন না যে, আমার সময় নষ্ট হচ্ছে, তোমাদের ঔষধ আমি দিয়ে দিয়েছি তোমরা চলে যাও। শিয়ালকোটী সাহেব লিখেন যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) কখনও বলেন নি যে, তোমাদের আর কি কাজ আছে? শুধু শুধু আমাদের সময় নষ্ট করছ।

একবার গ্রাম্য মহিলারা সন্তানদের নিয়ে তার কাছে আসে, ভিতর থেকে কয়েকজন খাদেমা শরবত নিয়ে বেরিয়ে আসে। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দ্রুত একটি ধর্মীয়পুস্তক লেখার ছিল। আমিও দৈবক্রমে সেখানে যাই আর দেখি, হুযূর তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন যেভাবে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকে, সেভাবে দাঁড়িয়ে আছেন এবং ৪/৫টি সিন্দুক খুলে রেখেছেন আর সেখানে কিছু শিশি ছিল যেখান থেকে তিনি কাউকে ঔষধ দিচ্ছিলেন আর কাউকে নির্যাস দিচ্ছিলেন। টানা তিন ঘণ্টা পর্যন্ত ঔষধ দিতে থাকেন তাদেরকে, আর হাসপাতাল খোলা থাকে। সবার পরে আমি হুযূরকে বললাম যে, হুযূর! এটাতো অনেক কষ্টকর বিষয় আর এর কারণে আপনার মূল্যবান অনেক সময় নষ্ট হয়। দেখুন! হুযূর কত সুন্দরভাবে আমাকে উত্তর প্রদান করেন। দেখ! এটা তো ধর্মীয় কাজ এবং কত সুন্দর কাজ। মানবসেবা করা, রোগীদের ঔষধ দেয়া, তাদের খবরাখবর নেয়া একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। এরা দরিদ্র মানুষ আর এখানে কোন হাসপাতাল নেই। এদের জন্য আমি সকল প্রকার এলোপ্যাথিক এবং দেশীয় ঔষধ আনিয়ে রাখি যেন যথাসময়ে তা কাজে লাগে। তিনি (আ.) বলেন, এটি একটি পুণ্যের কাজ। এ ধরনের কাজে মু'মিনদের কখনই উদাসীনতা ও অলসতা দেখানো উচিত নয়।

শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব বলেন, লালা মালাওয়ালাম যার বয়স ২২ বছর ছিল। একবার তিনি অসুস্থ হলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রীতি ছিল, তিনি সকাল-সন্ধ্যা জামাল নামক এক সেবকের মাধ্যমে তার খবর নিতেন আর দিনে একবার নিজে গিয়ে তাকে দেখে আসতেন। এটি স্পষ্ট বিষয় যে, লালা মালাওয়ালাম ভিন্ন ধর্মের মানুষ ছিল কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে যেহেতু তার আসা-যাওয়া ছিল তাই মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে তার সম্পর্ক ছিল। দেখুন! তিনি কত মানবিক সহানুভূতি পোষণ করতেন। এখানে শুধু রোগীর কথাই বলা হচ্ছে না বরং মসীহ্ মাওউদ (আ.) বন্ধুত্বের খেয়ালও রেখেছেন। ভিন্ন ধর্মের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার বন্ধুত্বের দাবি পূরণ করেছেন এবং রোগী দেখার দায়িত্ব পালন করেছেন। বন্ধুত্বের এত খেয়াল করতেন যে, তার ঘরে গিয়ে তাকে দেখে আসতেন এবং নিজেই তার চিকিৎসা করতেন। একদিন লালা মালাওয়ামাল বলেন, তাকে একটা ঔষধ দেয়া হয়েছে আর এর ফলাফল যা হয়েছে তা হল, সে রাতে ১৯ বার টয়লেটে যায় এবং শেষে রক্ত বের হওয়া শুরু হয় আর সে অনেক দুর্বল হয়ে যায়। প্রতিদিনের মত সকালে যখন হুযূরের খাদেম তার খবর নিতে যান তখন তার সামনে প্রকৃত খবর তুলে ধরা হয় এবং বলে, হুযূর যেন তাকে দেখতে যান। হুযূর তাৎক্ষণিকভাবে তার সঙ্গে দেখা করতে যান এবং তার অবস্থা দেখে তিনি অনেক কষ্ট পান। সে বলে, তখন আরও কিছু ঔষধের সাথে মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসুবগুল আমাকে খেতে দেন এরপর

আমার রক্ত আসা বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধুত্ব, প্রতিবেশীর অধিকার এবং রোগীর যে প্রাপ্য– এভাবেই তিনি তা প্রদান করেছেন।

শেখ ইয়াকুব আলীর ইরফানি সাহেব আবার বলছেন, লালা শরমপথ রায় একদা অসুস্থ হয়ে যায়। তার পেটে একটি ফোঁড়া বের হয়। আর এই ফোঁড়া অনেক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। হুযূর (আ.) সংবাদ পেয়ে নিজেই শরমপথ রায়ের বাসায় যান। খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি ছিল। সেখানে গিয়ে তিনি তাকে দেখে আসেন। তিনি অনেক আতঙ্কিত ছিলেন আর ভাবতেন যে, তিনি মারা যাবেন। উৎকণ্ঠার মধ্যে তিনি এমন কথা বলতেন। তখন হুযূর (আ.) তাকে আশ্বস্ত করেন আর বলেন, তুমি ভয় পেয়ো না। আমি ডাক্তার আব্দুল্লাহ সাহেবকে নিযুক্ত করছি, তিনি আপনার ভালভাবে চিকিৎসা করবেন। তখন কাদিয়ানে তিনিই একমাত্র বড় ও ভাল ডাক্তার ছিলেন। দ্বিতীয় দিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ডাক্তারের সঙ্গে আসেন। তিনি শুধু ডাক্তারকে একাই পাঠিয়ে দেন নি বরং নিজেও ডাক্তারের সঙ্গে এসেছিলেন। ডাক্তারকে বিশেষভাবে শরমপথ রায়ের চিকিৎসার দায়িত্ব প্রদান করেন। এর কোন দায়িত্ব শরমপথ রায়ের ওপর চাপানো হয় নি এমনকি খরচের ভারও না। প্রতিদিন বিনা ব্যতিক্রমে হুযূর (আ.) তাকে দেখতে যেতেন আর যখন ক্ষত ঠিক হওয়া আরম্ভ হয় আর তার নাজুক অবস্থা সুস্থতায় রূপান্তরিত হতে থাকে তখন তিনি (আ.) কিছুদিন পরপর যেতেন, কিন্তু তিনি তাকে ততদিন পর্যন্ত দেখতে যান যতদিন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে ওঠেন। এটি হল বন্ধুত্ব রক্ষার ও রোগীকে দেখাশুনা করার উত্তম দৃষ্টান্ত এবং এই দায়িত্ববোধ তিনি (আ.) এভাবেই পালন করতেন।

মহানবী (সা.) যে পাঁচটি বিষয়কে এক মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের প্রাপ্য আখ্যায়িত করেছেন সেই পাঁচটির মধ্যে একটি হচ্ছে রোগীকে দেখতে যাওয়া। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, এক মুসলমানের প্রতি আরেক মুসলমানের পাঁচটি করণীয় বিষয় রয়েছে। ১) সালামের উত্তর দেওয়া ২) ডাকার সাথে সাথে লাব্বায়েক বলা ৩) জানাযায় উপস্থিত হওয়া ৪) রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং ৫) যে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে তার প্রত্যুত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।

এর পরবর্তী যে অধিকারের বিষয় আমি উল্লেখ করব তা **এতিমদের অধিকার** সম্পর্কে। এতিমদের অধিকার বা প্রাপ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কী বলেন? তিনি বলেন, وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ *(সূরা আন'আম: ১৫৩)*

অর্থ: আর এতিম প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত যথাযথ পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া (তার) ধনসম্পদের কাছেও যেও না। অর্থাৎ, কোন এতিমকে যদি লালনপালন করতে হয় এতিমের সম্পদ যদি থাকে তাহলে এতিমের লালনপালনের নামে তোমরা তার সম্পদ ভক্ষণ করো না। কোন মানুষের যদি আর্থিক সচ্ছলতা থাকে তাহলে নিজের পয়সায় এতিমের লালনপালন করা উচিত। এটি সবচেয়ে উত্তম পন্থা আর যদি কারো সঙ্গতি না থাকে আর এতিমের সম্পত্তি থেকে যদি ব্যয় করতে হয় তাহলে সাবধানে ব্যয় করবে। শুধু ততটুকুই ব্যয় কর যতটুকু লালনপালনে ব্যয় হয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলছেন,

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۖ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

(সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৫)

অর্থ: আর তোমরা (এতিমদের অধিকার সংরক্ষণের) সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন না করে এতিমের ধনসম্পদের কাছে যেও না। সে পরিপক্ব না হওয়া পর্যন্তও (তার ধনসম্পদের কাছে যেও না) এবং তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, কেননা অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জবাবদিহি করা হবে। এখানে বিষয়টা আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, শুধু অবৈধভাবে এতিমদের সম্পদ খাবে না বরং তার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণও করতে হবে। এতিম যখন সাবালক হয়ে যাবে তখন তার সম্পদ তার হাতে তুলে দিতে হবে। এতিমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের একটি অর্থ হল, যে লাভজনক পন্থায় তার সম্পদ বিনিয়োগ করা যায় তা কর আর এতিমকে লালনপালন করার এটি একটি পন্থা ।

করআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا

(সূরা আদ্ দাহর: ৯)

অর্থ: তাঁরই ভালবাসায় তারা অভাবী, এতিম এবং বন্দীদের খাওয়ায়। এটি মু'মিনের একটি মর্যাদা যে, প্রয়োজন সত্ত্বেও ত্যাগ স্বীকার করে তারা অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ

(সূরা আল্ ফজর: ১৮)

অর্থ: সাবধান! আসলে তোমরা এতিমদের সম্মান কর না। অর্থাৎ, তোমরা যদি এতিমদের সম্মান না কর, তাদের অধিকার আদায় না কর তাহলে তোমাদের শাস্তি পেতে হবে। তাই সাবধান থাক।

করআনে বর্ণিত হয়েছে,

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ *(সূরা আয্ যোহা: ১০)*

অর্থ: অতএব এতিমের প্রতি তুমি কঠোর হয়ো না। অতএব কত সুন্দরভাবে আল্লাহ্ তা'লা এতিমদের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, তারা সমাজের অনেক দুর্বল বরং দুর্বলতম শ্রেণি। উপনীত বয়সে পদার্পণ না করা পর্যন্ত তাদের দেখাশোনা করা এবং তাদের সকল অধিকার প্রদান করা– এটি মু'মিনদের জন্য আবশ্যক শর্ত।

এরপর দেখুন! কত সুন্দরভাবে মহানবী (সা.) কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমে এতিমদের দেখাশোনা করার উপদেশ প্রদান করেছেন। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে এসব কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রা.)-এর স্ত্রী

হযরত যয়নাব (রা.)-এর পক্ষ হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, আমি মসজিদে ছিলাম, আমি হুযূর (সা.)-কে দেখেছি, তিনি বলতেন, তোমরা মহিলারা সদকা কর তা তোমার অলঙ্কার দিয়ে হলেও। হযরত যয়নাব (রা.) আব্দুল্লাহসহ কতক এতিমদের দেখাশোনা করতেন। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে তিনি ব্যয় করতেন আর এ কারণে তিনি আব্দুল্লাহ্‌কে বলেন, হুযূরকে জিজ্ঞেস কর, আমার পক্ষ থেকে কি সেই সদকা দিতে হবে, নাকি আমি যে এতিমদের লালনপালন করি, তাদের জন্য ব্যয় করি এটাই যথেষ্ট হবে? হযরত আবদুল্লাহ বলেন, তুমি নিজেই মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস কর। তখন আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই। দরজায় একজন আনসার নারীকে দেখি যার প্রশ্নও আমার অনুরূপ ছিল। সে-ও প্রশ্ন করতে চাচ্ছিল। ততক্ষণে বেলাল আমাদের পাশ দিয়ে যায় আমরা তাকে বললাম, আমাদের পরিচয় উল্লেখ না করে তুমি মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস কর, আমাদের পক্ষ থেকে এটাই কি যথেষ্ট হবে না যে, আমি আমার স্বামী এবং এমন কিছু এতিম যারা আমার কাছে আছে তাদের জন্য ব্যয় করি। তখন বেলাল (রা.) ভিতরে যান আর মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, সেই দুই নারী কারা যারা প্রশ্ন করছে? হযরত বেলাল (রা.) বলেন, যয়নাব, হুযূর বলেন কোন্ যয়নাব? হযরত বেলাল (রা.) বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রা.)-এর স্ত্রী যয়নাব। তখন তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ! তার জন্য দুটি পুরস্কার নির্ধারিত আছে। একটি নিকটাত্মীয় হবার জন্য পুরস্কার পাবে আরেকটি সদকা হিসেবেও পুরস্কার পাবে। সে যে ব্যয় করছে– তার পুরস্কার অবশ্যই পাবে।

এছাড়া হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, এতিমদের দেখাশোনাকারী আর আমি জান্নাতে এমনভাবে অবস্থান করব যেভাবে এই দুটি একসঙ্গে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি শাহাদত আঙ্গুল ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্র করে দেখিয়ে বলেন, এ দুটি যেভাবে একসঙ্গে রয়েছে আমি এবং সেই ব্যক্তি যে এতিমদের দেখাশোনা করে জান্নাতে এভাবে একসঙ্গে থাকব। শুধু শিক্ষাই দেন নি বরং এর বাস্তব দৃষ্টান্তও তিনি (সা.) দেখিয়েছেন।

হযরত অওম বিন আবু জুহায়ফা (রা.) তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, আমাদের কাছে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে সদকা সংগ্রহকারী এসে ধনীদের কাছ থেকে যাকাত নিয়ে গরিবদের মাঝে বিতরণ করছিল। আর আমি এতিম ছিলাম তাই তিনি আমাকে সেই সম্পদ থেকে একটি উটনী দিয়েছিলেন। সেই যুগে এটি কোন সাধারণ বিষয় ছিল না যে, একটি উটনী দিয়ে দেয়া হবে তা-ও আবার একজন এতিম ছেলেকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন এতিমকে খাবার খাওয়াবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি দুই দুর্বলের অধিকার সম্পর্কে কঠোরভাবে সতর্ক করে থাকি। এক হচ্ছে এতিম অপরটি মহিলা বা নারী। যদি অধিকার প্রদান না কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির আওতায় চলে আসবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম গৃহ সেটি যেখানে কোন এতিম থাকে এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করা হয়। আর মুসলমানদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট গৃহ সেটি যেখানে কোন এতিম থাকে এবং তার সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়। হুযূর (সা.) এটি এতটা অপছন্দ করেছেন! এতিমের অধিকার যারা প্রদান করে না তাদেরকে তিনি (সা.) কঠোরভাবে সাবধান এবং হুঁশিয়ার করেছেন।

এরপর এতিমদের যারা লালনপালন করে তাদের সুসংবাদ দিতে গিয়ে তিনি (সা.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, এতিমদের মধ্য থেকে তিনজনকে যে লালনপালন করবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে সারারাত দাঁড়িয়ে নফল নামায আদায় করে, দিনের বেলায় রোযা রাখে আর নিজের তরবারি ধারণ করে সকাল-সন্ধ্যা জেহাদে বের হয়েছে। আমি এবং সেই ব্যক্তি জান্নাতে সেভাবেই ভাই হব যেভাবে এই দুই আঙ্গুল অর্থাৎ তিনি (সা.) শাহাদত আঙ্গুল আর মধ্যমা আঙ্গুল একত্রিত করে দেখান।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা একস্থানে বলেছেন,

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا

(সূরা আদ্ দাহর: ৯-১০)

অর্থ: আর তাঁরই ভালবাসায় তারা অভাবী, এতিম এবং বন্দীদের আহার করায়। (আর তারা বলে,) আমরা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তোমাদের আহার করাই। আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও চাই না। এর অর্থ হল, আমরা কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষী। এখন চিন্তা করা উচিত, এসব আয়াত দ্বারা কত সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, পবিত্র কুরআন উন্নত মানের ঐশী ইবাদাত বা আমলের সালেহ্‌র জন্য এটি শর্ত রেখেছে যে, ঐশী ভালবাসা ও খোদা তা'লার সন্তুষ্টি যেন তোমাদের হৃদয়ের বাসনা হয়। আল্লাহ্ তা'লা এই ধর্মের নাম ইসলাম এজন্যই রেখেছেন যাতে মানুষ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অধীনে খোদা তা'লার ইবাদত না করে বরং স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই করে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য একটি উদ্দীপনা যেন কাজ করে, কেননা সকল স্বার্থ পরিত্যাগ করার পর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের নামই হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এমন হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, নিঃসন্দেহে খোদা তা'লার রহমত

বর্ষণের জন্য মু'মিনদেরকে সাধারণ উপকরণাদি নিয়ামত হিসেবে দিয়েছেন কিন্তু মু'মিনদের মধ্যে যারা উন্নত মর্যাদা পেতে চায় তাদেরকে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে, যেন তারা ব্যক্তিগত ভালবাসার খাতিরে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করে এবং তাঁর জন্য এতিম মিসকিনদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে। এটি মানুষের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা সৃষ্টি করে।

মহানবী (সা.)-এর যুগের ঘটনা, এক এতিম শিশু ছিল যাকে নিয়ে সাহাবীদের মাঝে ঝগড়া বাঁধে। একজন বলে যে, আমি এর লালনপালন করব আর আরেকজন বলে, না আমি লালনপালন করব। অবশেষে মহানবী (সা.)-এর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। তিনি (সা.) বলেন, সন্তানটিকে সামনে নিয়ে আস। সে যাকে পছন্দ করবে তাকে তার কাছেই দিয়ে দাও।

এভাবে সাহাবীগণ এই দায়িত্ব পালনের জন্য সদা অগ্রগামী থাকার চেষ্টা করতেন।

অঙ্গীকার রক্ষার প্রতি ইসলাম জোরালোভাবে আদেশ প্রদান করে আর সকল অর্থে অঙ্গীকার পালন করার নির্দেশ প্রদান করে। অনেক সময় কোন শত্রু চালাকি করে মুসলমানদের সাথে চুক্তি করে, তখনও সেই যুগের খলীফা বলেছেন যে, না সেই অঙ্গীকারও রক্ষা করতে হবে। ইতিহাসে সেই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে একজন হাবশী কৃতদাস এক জাতির কাছে এই প্রতিশ্রুতি দেয়, অমুক অমুক সুযোগ তোমাদের দেয়া হবে আর যখন ইসলামী সৈন্যবাহিনী সেখানে উপস্থিত হয় তখন সেই জাতির লোকেরা বলে, আমাদের সঙ্গে তো এই চুক্তি করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চায় নি। তখন এই কথা হযরত উমর (রা.)-এর কাছে উপস্থাপন করা হয়। তিনি (রা.) বলেন, মুসলমানদের কথা মিথ্যা হওয়া উচিত নয়। একজন ক্রীতদাস প্রতিশ্রুতি দিলেও তা আমাদের পালন করতেই হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ে বলেন,

إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلٰى مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

(সূরা আত্ তাওবা: ৪)

অর্থ: তবে সেসব মুশরিকের কথা ভিন্ন যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হবার পর তারা তোমাদের সাথে কোন প্রকার চুক্তি ভঙ্গ করে নি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করে নি। অতএব তোমরা তাদের সাথে (নির্ধারিত) মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। অতএব যারা তাকওয়ার উপরে পরিচালিত তাদের জন্য একটি শর্ত হচ্ছে তারা অঙ্গীকার পালন করে অর্থাৎ এই অধিকার সংরক্ষণ করে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি এমন লোককে হত্যা করে যার সঙ্গে তার অঙ্গীকার ছিল, সে জান্নাতের সুবাস পাবে না, অথচ জান্নাতের সুবাস তো এমন যা ৪০ বছরের দূরত্বে থেকেও মানুষ তার ঘ্রাণ পেয়ে থাকে। এতটা বিস্তৃত জান্নাতের সুবাস। তাই যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে সে সেই সুবাস থেকে বঞ্চিত থাকবে।

সাহাবীদের সন্তানদের বরাতে বর্ণিত হয়েছে, তারা তাদের পিতা থেকে বর্ণনা করেছে, এক ব্যক্তির বন্ধু আত্মীয় ছিল, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার জিম্মায় থাকা কোন ব্যক্তির ওপর অন্যায় করবে অথবা তার অধিকার প্রদানে কমতি করবে বা তার ওপর সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপাবে কিংবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিবে, আমি সেই ব্যক্তির সাথে কেয়ামতের দিনে ঝগড়া করব। এজন্য যারা জিম্মায় থাকে তাদের সাথেও অঙ্গীকার রক্ষার বিষয় রয়েছে আর এটি রক্ষা করা মুসলমানদের জন্য ফরয।

এরপর তিনি (সা.) অঙ্গীকার রক্ষার বিষয়ে এত সতর্ক ছিলেন যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আমানি (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যিম্মিদের মধ্য থেকে হত্যার বিপরীতে মুসলমানদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেন এবং বলেন, আমি এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখি, যে নিজের দায়িত্ব অধিক পালনকারী। অর্থাৎ একজন মুসলমান তার জিম্মায় থাকা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল যার কারণে তাকে তিনি (সা.) হত্যা করেছিলেন।

হযরত আরবাজ বিন সুলামি (রা.) বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে খায়বারের ময়দানে যাই। তাঁর (সা.) সাহাবীগণও তাঁর সাথে ছিল। খায়বারের শাসক ছিল ভীষণ দুষ্টপ্রকৃতির এবং নৈরাজ্যসৃষ্টিকারী। সে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে আর বলে, হে মুহাম্মদ! তোমার জন্য কি এটি বৈধ হবে যে, তুমি আমাদের গাধাকে জবাই করবে এবং আমাদের ফসলাদি নিয়ে নিবে আর আমাদের মহিলাদের হত্যা করবে? এই কথা শুনে মহানবী (সা.) খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, হে ইবনে আওফ! তুমি তোমার ঘোড়ায় আরোহন করে ঘোষণা কর, 'আর জেনে রেখ! জান্নাত শুধু মু'মিনদের জন্য বৈধ। আর তোমরা সবাই নামাযের জন্য সমবেত হও।' বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা নামাযের জন্য সমবেত হয়। মহানবী (সা.) তাদের সঙ্গে নামায পড়েন, এরপর তিনি (সা.) দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার ক্ষমতার আসনে বসে এমন মনে করছ যে, আল্লাহ্ তা'লা কেবল সেগুলোকেই হারাম করেছেন যা কুরআন করীমে রয়েছে? আর তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি নসীহত করেছি আর তোমাদেরকে বিধিনিষেধ সম্পর্কে বলেছি। অর্থাৎ অনেক আদেশ-নিষেধের বিষয় আমি বর্ণনা করেছি। এগুলোর সংখ্যা এত যে, কুরআন শরীফের সমপরিমাণ বা এরচেয়ে বেশি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা মহাপরাক্রমশালী এবং তিনি তোমাদের জন্যে বৈধ করেন নি যে, তোমরা আহলে

কিতাবদের বাড়িতে তাদের অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করবে। এছাড়া তাদের মহিলাদেরও হত্যা করার অনুমতি নেই আর তাদের ফল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করারও অনুমতি নেই। তারা তাদের ওপর নির্ধারিত কর প্রদান করছে তাই এসবের কোন অনুমতি নেই।

এরপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) আমর গোত্রের দুই ব্যক্তিকে মুসলমানের মতই অধিকার প্রদান করেছেন, কেননা তাদের সাথে মহানবী (সা.)-এর চুক্তি ছিল আর এটি তাদের অধিকার। হত্যা করেছিল তাই অধিকার প্রদান করেছেন। অতএব অমুসলিমদের সাথেও চুক্তি পালন করা আবশ্যকীয় এবং এটি তাদের অধিকার। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা যা ইতিহাসে পাওয়া যায় এবং হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-ও এটি বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) জোরালো নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, সন্ধিচুক্তি যার সাথেই হোক এমনকি যদি কাফেরদের সাথেও হয় তাহলে তা রক্ষা করতে হবে। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কাফেরদের সঙ্গে এই সন্ধিও হয়েছিল যে, তোমাদের ওখান থেকে কোন ব্যক্তি যদি আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হয় তবে আমরা তাকে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিব আর আমাদের কেউ যদি তোমাদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয় তাহলে তোমরা তাদেরকে রাখতে পারবে। এটি অনেক কঠিন শর্ত ছিল। সমঅধিকারের চুক্তি ছিল না। চুক্তিনামা লেখা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তখনও স্বাক্ষর করা হয় নি। এমতাবস্থায় আবু জান্দল নামের এক ব্যক্তি যাকে লোহার শিকল পরিহিত অবস্থায় বেঁধে রাখা হত এবং যিনি ইতিমধ্যে অনেক দুঃখকষ্ট বরণ করেছিলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে তিনি ছুটে আসেন এবং নিজের কষ্টকর পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যান, কেননা এরা আমার মুসলমান হবার কারণে আমাকে অনেক কষ্ট দেয়। সাহাবীরাও বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! একে আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়া উচিত। সে কাফেরদের হাতে অনেক নির্যাতন সহ্য করেছে। তখন তার পিতা বলে, আপনারা যদি একে নিজেদের সাথে নিয়ে যান তাহলে গাদ্দারী করা হবে যা আপনার চুক্তিভঙ্গের কারণ হবে। সাহাবীরা বলেন, এখনও চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করা হয় নি। সে বলে, লেখা হয়েছে স্বাক্ষর হয় নি তো কি হয়েছে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, একে ফিরিয়ে দাও। আমরা চুক্তির কারণে একে নিজের কাছে রাখতে পারি না। এর পিতা ঠিক বলছে। এতে সাহাবীরা অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি (সা.) তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আর মহানবী (সা.) যখন মদিনায় আসেন, তখন সে আবার কোনভাবে পালিয়ে মদিনাতে আসে তখন তাকে নেয়ার জন্য দুই ব্যক্তি তার পিছনে পিছনে আসে। তারা মহানবী (সা.)-কে বলে, আপনি আমাদের সঙ্গে চুক্তি করেছেন আমাদের লোকদেরকে আপনি আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। হুযূর (সা.) বলেন, হ্যাঁ! ঠিক তাই। তোমরা তাকে নিয়ে যাও। যে মুসলমান ছুটে এসেছিল সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এরা আমাকে অনেক কষ্ট দেয় এবং আমার ওপর নির্যাতন চালায়। এদের সঙ্গে আমাকে ফেরত পাঠাবেন না। হুযূর (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ প্রদান করেছেন আমি যেন বিশ্বাসঘাতকতা না করি। এজন্য তুমি তাদের সঙ্গে ফিরে যাও। সে ফেরত যায় এবং পথিমধ্যে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফিরে আসে। এসে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার সঙ্গে তার সন্ধিচুক্তি ছিল আর আপনি তা পূরণ করেছেন কিন্তু এদের সঙ্গে আমার যেতে হবে, আমার এমন কোন চুক্তি ছিল না। তাই আমি তাদের সঙ্গে যাব না। এরপর অপরজন তাকে ফেরত নেয়ার জন্য আসে তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি তোমাকে আমাদের কাছে রাখতে পারব না। আবার তিনি তাকে তাদের সঙ্গে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু সেই ফেরত নিতে আসা ব্যক্তি একা তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে নি। সে থেকে যায় বরং বর্ণনায় পাওয়া যায়, এরপর সে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল কিংবা মদীনায় কিন্তু সেখানে ছিল না। আর মহানবী (সা.)-ও তাকে বারবার বলেছিলেন, আমি যে চুক্তি করেছি তা ভঙ্গ করতে পারব না। তিনি কাফেরদের সঙ্গে চুক্তির কারণে একজন মুসলমানের চরম বিপদ দেখেও তিনি তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় একটি শর্ত ছিল, আরবের যেকোন গোত্র চাইলে মহানবী (সা.)-এর দলে মিলিত হতে পারবে আবার যেকোন গোত্র চাইলে মক্কায় গিয়ে কাফেরদের সাথে যোগ দিতে পারবে। দুই পক্ষের দায়িত্ব হল, তারা পরস্পর তো ঝগড়াবিবাদ করবেই না বরং আর যারা যে পক্ষের সাথে মিলিত হচ্ছে তাদের সঙ্গেও ঝগড়াবিবাদ করবে না। মক্কার লোকেরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মুসলমানদের একটি বন্ধু-গোত্রের ওপর আক্রমণ করে বসে। তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে অভিযোগ করে এবং তিনি তার মিত্র গোত্রকে সাহায্য করার জন্য মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধ করা তাদের অধিকার ছিল। সর্বোপরি মুসলমানদের জন্য তাদের অধিকার পাইয়ে দেয়া এবং মক্কাবাসীদের অধিকার ভঙ্গ করার শাস্তি প্রদান করা আবশ্যক ছিল। যাহোক মক্কাবাসীরা যখন সন্ধান পায় তখন তারা আবু সুফিয়ানকে পাঠায়। সে মসজিদে নববীতে এসে ঘোষণা করে, আমি যেহেতু চুক্তির সময় উপস্থিত ছিলাম না তাই নতুন করে সন্ধিচুক্তি করতে হবে। কিন্তু মুসলমানেরা বলে, শিশুসুলভ কথা বল না। চুক্তি তো করা হয়ে গিয়েছে আর তোমরা তা ভঙ্গ করেছ। তখন সে চরম লজ্জিত হয়ে ফেরত চলে যায় আর এর ফলেই মক্কা বিজয় হয়েছিল।

এরপর **যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অধিকার** রয়েছে। সাধারণত যুদ্ধবিগ্রহ হয়েই থাকে আজকাল যেসব যুদ্ধ হয়

এগুলো শুধু নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ এবং সীমানা বৃদ্ধির লড়াই। বর্তমানে তো একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করার জন্য যুদ্ধ করে থাকে। তারা অধিকার প্রদানের কথা বলে ঠিকই কিন্তু মূলত অধিকার খর্ব করে। কিন্তু ইসলাম যে যুদ্ধের অনুমতি দেয় তা শুধুমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য এবং অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। যুদ্ধের পাশাপাশি শত্রুদের অধিকার প্রদানের কথাও ইসলাম বলে থাকে। যখন প্রথম যুদ্ধ করার অনুমতি অবতীর্ণ করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ

(সূরা আল্ হাজ্জ: ৪০)

অর্থ: যাদের বিরুদ্ধে (বিনা কারণে) যুদ্ধ করা হচ্ছে এখন তাদের (আত্মরক্ষামূলক) যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, কেননা তাদের ওপর অন্যায় করা হচ্ছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ

(সূরা আল্ হাজ্জ: ৪১)

অর্থ: (অর্থাৎ) সেইসব লোক যাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে তারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি মানুষের একদলকে আর একদল দিয়ে প্রতিহত করা না হত তাহলে সাধুসন্ন্যাসীদের মঠ, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় ধ্বংস করে দেয়া হত আর মসজিদসমূহও (ধ্বংস করে দেয়া হত) যেখানে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে তাঁকে (ধর্মের পথে) সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা শক্তিধর, মহা পরাক্রমশালী।

আল্লাহ্ বলেন, তাদের যদি লাগামহীন ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে কোন ধর্মীয় উপাসনালয় আর অবশিষ্ট থাকবে না। এরা আক্রমণ করে সবকিছু ধ্বংস করে দিবে। আল্লাহ্ তা'লা ইনসাফের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

(সূরা আল্ মায়েদা: ৯)

অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসাবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদের যেন কখনও অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সদা ন্যায়বিচার কর। এ (কাজটি) তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটে। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।

যুদ্ধের সময় মানুষের অধিকার প্রদানের বিষয়ে কথা হচ্ছে। মহানবী কিভাবে তাদের সে অধিকার প্রদান করেছেন! সোলেমান বিন বুরাইদা তার মায়ের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) যখন কোন অভিযানে কাউকে আমির নিযুক্ত করতেন তখন তাকে বিশেষভাবে খোদাভীতির কথা বলতেন এবং সাথী মুসলমানদের মঙ্গলের নসীহত করতেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার নামে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে। যুদ্ধ কর কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা কর না, অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না, কারও অঙ্গচ্ছেদ কর না এবং কোন শিশুকে হত্যা করবে না। মুশরিক শত্রুদের সঙ্গে যখন তোমাদের যুদ্ধ হবে তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাও। তিন শর্তের যেটি তারা মানবে তুমিও তাদের সাথে একমত হও এবং থেমে যাও। আর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান কর। তারা যদি তোমার কথা মান্য করে তাহলে তুমি তা গ্রহণ কর এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাক। তাদেরকে নিজেদের এলাকা থেকে মুহাজির এলাকায় আসার কথা বল আর বল, তারা যদি এমন করে তাহলে তারা মুহাজিরদের অনুরূপ অধিকার পাবে। আর তাদের দায়িত্ব তাই হবে যা মুহাজিরদের দায়িত্ব। যদি তারা স্থানান্তরিত হতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের বল, এক্ষেত্রে তোমাদের সাথে মরুবাসীদের মতোই ব্যবহার করা হবে। তাদের ওপরও আল্লাহ্ তা'লার একই নির্দেশ জারি করা হবে যা মু'মিনদের জন্য কল্যাণকর। আর তারা গনিমতের সম্পদ এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে কিছুই পাবে না কেবল তা ব্যতিরেকে যা তারা মুসলমানদের সাথে মিলে গিয়ে জিহাদ করে অর্জন করে। আর যদি তারা এরূপ করতে অসম্মত হয় তবে তাদের কাছ থেকে জিযিয়া কর দাবি করবে আর যদি তারা কথা মেনে নেয় তাহলে তোমরা মেনে নাও এবং তাদের ওপর হামলা করা থেকে বিরত থাক। আর যদি তারা অস্বীকার করে তাহলে তোমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আর যদি তোমরা দূর্গবাসীদের সুরক্ষিত কর আর তারা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আশ্রয় চায় তাহলে আল্লাহ্‌র রসূলের জিম্মায় দিবে না বরং তোমাদের নিজেদের এবং নিজ সাথীদের জিম্মায় রাখবে। এর কারণ কি? কারণ হল, তোমরা যদি তোমাদের নিজেদের ও নিজ সাথীদের জিম্মা রক্ষা করতে না পার তাহলে এটি তার চেয়ে বেশি পাপ হবে যদি তোমরা রসূলের জিম্মা পূরণ করতে না পার। আর কোন দুর্গকে যখন তোমরা পরিবেষ্টন কর আর তারা যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশের ওপর আমল করার অনুমতি চায় তাহলে তোমরা তাদের আল্লাহ্‌র নির্দেশের অধীনে আনবে না বরং তোমাদের আদেশের অধীন কর কেননা তোমাদের জানা আছে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক তোমরা তাদের সুরক্ষা করতে পারবে কি না। তিনি (সা.) তাদেরকে যতটা নমনীয় হওয়া যায় ততটা নমনীয় হবার উপদেশ প্রদান করেছেন।

আরেকটি রেওয়ায়াতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) লুটপাট ও অঙ্গচ্ছেদ

করতে বারণ করেছেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন আয়েয (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী যখন কোন যুদ্ধবাহিনী প্রেরণ করতেন তখন বলতেন, মানুষের প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করবে। তাদের ওপর ততক্ষণ হামলা করবে না যতক্ষণ না তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। এই কারণে যে, পৃথিবীর সকল মানুষ ঘরে থাকুক বা তাদের স্ত্রী-সন্তানদের কয়েদী করে নিয়ে আসা হোক এবং তাদের পুরুষদের হত্যা করার চাইতে তদের মুসলমান হওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার নাম নিয়ে বের হও। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ধর্ম সাথে নিয়ে বের হও আর কোন দুর্বল, কোন শিশু, কোন নাবালক এবং কোন মহিলাকে হত্যা করবে না। তোমরা খেয়ানত করবে না এবং মালে গণিমত একত্রিত করে রাখবে। আর নিজেদের পরিবারের সংশোধন করবে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে, কেননা আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহকারীকে ভালবাসেন।

আবার আরেকটি বর্ণনায় হযরত আসওয়াদ বিন সারীক (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) হুনায়েনের যুদ্ধে একটি দলের যাত্রা করালেন। তারা মুশরেকদের হত্যা করে আর এই হত্যা মুশরেকদের সন্তানদের হত্যা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকল। তারা যখন ফেরত আসে তখন হুযূর (সা.) তাদের বলেন, কেন তোমরা শিশুদের হত্যা করেছ? তোমাদের তো এই অধিকার ছিল না বরং তোমরা এই শিশুদের অধিকার ক্ষুণ্ন করেছ। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তারা তো মুশরেকদের সন্তান ছিল। তখন হুযূর (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা এখন উত্তম ব্যক্তিরা আছ তারা কি মুশরেকের সন্তান নও? সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের (সা.) জীবন! পৃথিবীতে জন্ম নেয়া প্রতিটি জীবনই একই স্বভাবের হয়ে জন্মায়, যতক্ষণ না তার মুখনিঃসৃত কথার মাধ্যমে সে ধর্ম বদলায়।

হযরত রেবা বিন রাবিস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে তিনি একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি (সা.) দেখলেন, কিছু লোক এক জায়গায় একত্রিত হয়েছে। তখন তিনি (সা.) এক ব্যক্তিকে পাঠালেন সে যেন গিয়ে দেখে সেখানে এত ভীড় কেন? তিনি দেখে এসে জানান, সেখানে একজন মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে যার কারণে মানুষ একত্রিত হয়েছে। হুযূর (সা.) বললেন, তাকে কেন মারা হয়েছে, সে তো যুদ্ধও করে নি। লোকেরা বলল, সামনে খালেদ বিন ওয়ালিদের যুদ্ধব্যুহ। তখন হুযূর (সা.) বলেন, তাকে বলে দাও, কোন মহিলা আর শিশুকে যেন হত্যা করা না হয়।

মক্কা বিজয়ের সময় হুযূর (সা.) খালেদ বিন ওয়ালিদকে বললেন, তুমি মক্কার পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করে সাফায় গিয়ে আমার সাথে সাক্ষাত করবে। আর আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন, বাতনে ওয়াদির দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে এবং সামনে গিয়ে হুযূরের জন্য অপেক্ষা কর। তিনি (সা.) সবাইকে নির্দেশ দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কিছু না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ধরনের হাতিয়ার উঠবে না। তিনি (সা.) সাধারণভাবে সবার উদ্দেশ্যে এবং বিশেষত খালেদ (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে এই নির্দেশ প্রদান করেন। নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেক দিক থেকে ইসলামী সৈন্য মক্কায় প্রবেশ করতে থাকে। যে দিক দিয়ে খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন সেখানে শান্তি ও সৌহার্দ্যের এই বার্তা পৌঁছায় নি, তাই সেখানে কুরাইশদের কেউ কেউ তার মোকাবেলা শুরু করে দিল। এখানে যেহেতু তার মোকাবেলায় ইকরামা বিন আবু জাহল, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা এবং সাহল বিন আমর তাদের সঙ্গীসাথী নিয়ে তার ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল তাই তাকেও বাধ্য হয়ে অস্ত্র উঠাতে হয়েছিল। খান্দামা নামক স্থানে যেহেতু ঝোপঝাড় ছিল তাই সেখানে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে শত্রুদের ১২ জন মারা যায়। তাদের পরিণতি দেখে বাকিরা পালিয়ে যায়। এছাড়া আর কারও মোকাবেলা কিংবা প্রতিশোধ নেওয়ার সাহস হল না। এই খবর খালেদ বিন ওয়ালিদ-এর কাছে পৌঁছানোর পূর্বে মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছে গেল, আর এই আবেদন জানানো হল, তাকে থামানো না হলে গোটা মক্কাবাসীদের সে মেরে ফেলবে। তৎক্ষণাৎ তিনি (সা.) তাকে ডাকিয়ে এনে বলেন, আমি কি তোমাকে লড়াই করতে নিষেধ করি নি? তখন খালেদ (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি অবশ্যই নিষেধ করেছেন কিন্তু এরাই আগে আমাদের ওপর হামলা করে আর তির বর্ষণ শুরু করে। আমরা ধৈর্য ধরি আর বলি, আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করতে চাই না। তোমরা এমন আচরণ বন্ধ কর, কিন্তু তারা আমাদের কথা শুনে নি বরং অনবরত তির মারতেই থাকে। তাই তাদের সাথে লড়াই করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। মহানবী (সা.) তাদের এই কারণকে গ্রহণ করেন। এই ঘটনাটি ছাড়া আর কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে নি। বাকী সব সেনাপ্রধান নির্দেশনা অনুযায়ী নিজ নিজ স্থানে এসে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে মিলিত হন। আর সূর্যোদয়ের কিছু পরেই মক্কা মুকাররমা মুসলমানদের করায়ত্তে এসে যায় এবং পূর্ণ বিজয় লাভ করে। বর্তমানে আপত্তিকারীরা তো ইসলামের ওপর আপত্তি করতেই থাকে এমনকি কোন রাখঢাক ছাড়াই তারা হাসপাতাল কিংবা স্কুলে হামলা করে বসে। আকাশবোমা নিক্ষেপ করে, দালানকোঠা গুড়িয়ে দেয়, ঘরবাড়িতে শিশু ও মহিলাদের হত্যা করে। তারা কারও অধিকার আছে বলে মানতেই চায় না– অথচ তারাই ইসলামের ওপর আপত্তি উত্থাপন করে? মহানবী (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের মত এত অধিক অধিকার সংরক্ষণকারী আর কে আছে?

যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও ইসলাম ধর্ম কীভাবে শত্রুদের অধিকার সংরক্ষণ করেছে তা দেখুন! হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বক্তব্যের সারাংশ বর্ণনা করছি। **(১)** কোন অবস্থাতেই মুসলমানদের জন্য দেহ বিকৃত বা অঙ্গচ্ছেদ করার অনুমতি নেই। অর্থাৎ

মুসলমানদের জন্য শত্রুর মৃতদেহের অঙ্গচ্ছেদ করার অনুমতি নেই। (২) মুসলমানদের কখনই যুদ্ধের মধ্যে ধোঁকাবাজি করার অনুমতি নেই। (৩) কোন শিশুকে বা কোন মহিলাকে হত্যা করা যাবে না। (৪) পাদ্রী, পণ্ডিত কিংবা অন্যান্য ধর্মের পথপ্রদর্শকদের হত্যা করা যাবে না। (৫) বৃদ্ধ বা শিশু অথবা মহিলাদের হত্যা করা যাবে না। আর সর্বদা শান্তি ও সন্ধির প্রতি মনোনিবেশ হওয়া উচিত। (৬) মুসলমান যখন লড়াইয়ের জন্য যাবে তখন শত্রুদের দেশে যেন ভয়ভীতির সৃষ্টি না করে এবং সাধারণ মানুষদের ওপর কঠোরতা প্রদর্শন না করে। বিনা কারণে যেন জনসাধারণকে ভয় না দেখায়। (৭) যখন যুদ্ধের জন্য বের হয় তখন লোকদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে এমন জায়গায় যেন আক্রমণ না করে এবং এমন স্থান দখল না করে যাতে মানুষের জন্য পথচলা মুশকিল হয়ে যায়। রাস্তার মধ্যে যেন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে। ভয়ভীতি বা ত্রাস সৃষ্টি না করে। মহানবী (সা.) এ বিষয়ে অনেক কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি এই নির্দেশনার বিপরীতে যাবে সে তার নিজের জন্যই যুদ্ধ করবে, খোদার জন্য নয়। (৮) যুদ্ধের সময় শত্রুদের চেহারায় যেন আঘাত করা না হয়। (৯) যুদ্ধের সময় চেষ্টা করা উচিত শত্রুর যেন অনেক কম ক্ষতিসাধন হয়। (১০) যেসব ব্যক্তিরা বন্দী হয় তাদের মধ্যে নিকটাত্মীয়দেরকে যেন পৃথক না করা হয়। (১১) নিজের আরামআয়েশের চেয়ে বন্দীদের আরামের দিকে যেন বেশি খেয়াল রাখা হয়। (১২) অন্য জাতির প্রতিনিধিদের সম্মান করতে হবে। তারা ভুল করলেও যেন তা ঢেকে রাখা হয়। (১৩) কোন ব্যক্তি যদি বন্দীকে কষ্ট দিয়ে থাকে তাহলে সেই বন্দীকে যেন কোন রকম মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করা হয় অর্থাৎ বিনা কারণে যদি বাজে আচরণ করা হয় তবে সেই বন্দীকে মুক্ত করতে হবে। (১৪) কোন ব্যক্তির কাছে যদি যুদ্ধবন্দীদের রাখা হয় তবে সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়; তাকে যেন তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। আর সাহাবীরা (রা.) এর ওপরই আমল করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) এই বিধিনিষেধের আলোকেই এগুলোর সাথে আরও যোগ করেন, 'দালান ভাঙবে না এবং ফলদায়ী বৃক্ষ কর্তন করবে না।'

ঈবাদুর রহমানের তফসীর করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) লিখেন, ঈবাদুর রহমানের একটি চিহ্ন বলা হয়েছে, সে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না। এটিও আমরা সাহাবীদের জীবনে জাজ্বল্যমান হতে দেখি। তারা এর ওপর এত দৃঢ়ভাবে আমল করতেন যে, যারা তাদেরকে একসময় তরবারির জোরে ধর্মান্তরিত করতে চাইতো তারপরও তারা কেবল তাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করতেন যারা বাস্তবিকভাবে যুদ্ধে অংশ নিত। কোন মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, সন্যাসী, পণ্ডিত এবং পাদ্রীর ওপর তারা তরবারি চালাতেন না, কেননা তারা জানতেন– ইসলাম কেবল যুদ্ধে অবতরণকারী ব্যক্তিদের সাথে যুদ্ধের অনুমতি দেয়। অন্যদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ আখ্যা দেয় না। বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রসমূহ যখন নিজেদের শান্তি ও ন্যায়ের প্রতীক বলে দাবি করে এবং যাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যই সৃষ্টি বলে মনে করা হয় তাদের প্রকৃত অবস্থা হল, তারা সর্বদা শত্রুপক্ষকে এটম বোমা নিক্ষেপের হুমকি দিয়ে থাকে। বরং সত্যিকার অর্থে বিগত বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে এটম বোমা নিক্ষেপ করে লক্ষাধিক জাপানি পুরুষ-মহিলা-শিশুকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। আর এখনো বিভিন্ন দেশে যেসব যুদ্ধ হয়ে থাকে যেমন- ইরাক, ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং ইয়ামেন! সেখানে কী হচ্ছে? এসব স্থানে একই কাজ হচ্ছে। আর এগুলোকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার নাম দিয়ে বাহবা দিয়ে বলা হয়, আমরা এরূপ শান্তির কাজ করেছি। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদার যুগে কোনদিন এমন অত্যাচার দেখা যায় নি। তারা ক্ষমতা হাতে পাওয়া সত্ত্বেও কোন পুরুষ, মহিলা কিংবা কোন শিশুকে অন্যায়ভাবে পদদলিত করেন নি। পক্ষান্তরে এরা অন্যায়ভাবে লক্ষাধিক মানুষের রক্তে রঞ্জিত হাতকে ন্যায় ও সাম্যের মূর্তিমান প্রতীক বলে আখ্যা দেয় আর সেই মুসলমানদের যারা কখনও একটি পিঁপড়াকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করে নি– তাদেরকে এরা ডাকাত ও লুটেরা আখ্যা দেয়!

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মনে রাখা আবশ্যক, ইসলাম কেবল তাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণের অনুমতি দিয়েছে যারা প্রথমে তরবারি ধারণ করেছে এবং তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছে যারা প্রথমে হত্যাকাণ্ডের সূচনা করেছে।

অতএব এই ছিল কিছু অধিকার যা আমি বর্ণনা করেছি আর এগুলোই হল সেই অধিকারসমূহ যা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব। অন্যথায় এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার কেউ নেই। বিশেষকরে যুদ্ধের অধিকারসমূহ যা আমি বর্ণনা করেছি, তা যদি কোন সরকার না বুঝে এবং অন্যের অধিকার প্রদান না করে তবে গোটাবিশ্ব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিক যার ধ্বংসযজ্ঞতা সকলের কল্পনার বাইরে। আল্লাহ্ তা'লা এসব জাগতিক লোক এবং সরকারের শুভবুদ্ধি দান করুন। তারা নিজেদের আমিত্বের পরিবর্তে মানবতা রক্ষাকারী হোন। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানে প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হল, দোয়া করা যাতে এই পৃথিবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং এক ও অদ্বিতীয় খোদাকে মান্য করে আর মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা বুঝে ও সে অনুযায়ী আমল করে। আর এটিই চিরস্থায়ী কল্যাণ এবং চিরস্থায়ী হবার পন্থা আর পরবর্তী প্রজন্মের স্থায়ীত্বের চাবিকাঠি। আল্লাহ্ তা'লা সকলের বুদ্ধির উদয় ঘটান। পৃথিবীর প্রত্যেক আহমদীকে সকল দিক থেকে আল্লাহ্ নিরাপদে রাখুন এবং তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সকল অনিষ্ট থেকে প্রত্যেক আহমদীকে এবং প্রত্যেক অত্যাচারীকে পরিত্রাণ দিন, আমীন।

ভাবানুবাদ: পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' ডেস্ক

আহ্‌মদীয়া জলসা সালানার প্রেক্ষাপট ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রথম জলসা সালানার ভিত্তি

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'আসমানী ফয়সালা' পুস্তকে প্রস্তাবিত আঞ্জুমানের রূপরেখা দাঁড় করানোর লক্ষ্যে অধিক চিন্তা-ভাবনা করার দিকনির্দেশনা দিয়ে জামা'তের বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলেন, তারা যেন ১৮৯১ সালের ২৭ ডিসেম্বর কাদিয়ানে এসে সমবেত হয়। সেই মোতাবেক ২৭ তাং জামা'তের বন্ধুরা মসজিদে আকসা'তে এসে একত্রিত হন। যোহর নামাযের পর অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। প্রথমে মাওলানা আব্দুল করিম সিয়ালকোটী সাহেব (রা.) হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সদ্যলিখিত 'আসমানী ফয়সালা' পুস্তকটি পড়ে শুনান। এরপর প্রস্তাব আহ্বান করা হয় যে, কে কে আঞ্জুমানের সদস্য হবে এবং এই কার্যক্রমের সূচনা কীভাবে হবে? উপস্থিত বন্ধুরা সমস্বরে প্রস্তাব দিল- সর্বপ্রথম এই প্রবন্ধ প্রকাশ করা হোক এবং বিরোধীদের প্রতিক্রিয়া বুঝে উভয়পক্ষের পছন্দের লোকদেরকে মনোনয়ন দেয়া হোক। এরপর জলসা সমাপ্ত হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বন্ধুরা করমর্দন করেন। এটি ছিল জামা'তে আহমদীয়ার প্রথম ঐতিহাসিক মিলনমেলা এবং প্রথম সালানা জলসা যেখানে ৭৫জন বন্ধু অংশগ্রহণ করেন। *(তারীখে আহমদীয়াত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৪০)*

স্থায়ীভাবে জলসা সালানা অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৯১ সালের জলসার অনতিপরে ইশতেহারের মাধ্যমে জামা'তের সকল সদস্যকে এই মর্মে সুসংবাদ দেন যে, আগামীতে প্রতি বছর ২৭, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর জামা'তের জলসা সালানা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

১৮৯২ সাল ও তৎপরবর্তী জলসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পূর্বোক্ত ঘোষণা অনুযায়ী পরবর্তী বছর তথা ১৮৯২ সাল থেকে স্থায়ীভাবে এই জলসা সালানা চলতে থাকে। এই সিলসিলা পূর্ণ সফলতার সাথে আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। ১৮৯২ সালের জলসা'কে বড় জলসা বলা হয়। এ বছর প্রাচীরের অভ্যন্তরে তথা বর্তমান সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া অফিসভবনের পার্কিং-এ জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর মসজিদে আকসায় জলসা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। প্রথম খিলাফতের সময় গোড়া থেকে ৫বছর (১৯০৮-১৯১২সাল) পর্যন্ত মসজিদে আকসাতেই জলাসা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত মোট ১১ বছর 'মসজিদে নূর'-এ জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মোট ২৩ বছর যোগদানকারীর অধিক্যের কারণে কাদিয়ানের 'তা'লীমুল ইসলাম কলেজ'-এর মাঠে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ার বছর তথা ১৯৪৭ সালের জলসা পুনরায় মসজিদে আকসায় অনুষ্ঠিত হয়।

দেশ বিভাগের পূর্বে তথা ১৯৪৬ সালে খলীফার অংশগ্রহণে কদিয়ানে ভারতবর্ষের জলসা সালানায় উপস্থিতি ছিল প্রায় ৩৯ হাজার ৭৮৬ জন ব্যক্তি। মোটকথা সেই কাদিয়ানের জলসার ধারাবাহিকতায় আজও বিশ্বব্যাপী এক'শতের অধিক জামা'তে জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে শতসহস্র আহমদী ও অ-আহমদী সদস্যগণ অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অংশ নিয়ে থাকে।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত যুগ-খলীফার উপস্থিতিতে পাকিস্তানে সালানা জলসা চলমান ছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের লাহোরে প্রথম জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়। হিজরতের পর অর্থ, বাসস্থান এবং পরিবেশগত ব্যাপক সমস্যার সত্ত্বেও স্বল্পপরিসরে লাহোরের রতনবাগে এই জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত জলসায় লাহোরের বাইরে থেকে কেবলমাত্র দুই হাজার বন্ধু'র আগমনের অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং মহিলাদের অংশগ্রহণের

অনুমতি ছিল না। এ বছর ২৭, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর যথারীতি জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কাদিয়ানের বাইরে এটি ছিল প্রথম জলসা। জলসায় উপস্থিতি ছিল প্রায় ৬হাজার। পরবর্তী বছর থেকে কেন্দ্র রাবওয়াতে স্থানান্তরিত হয়ে গেলে সেখানে প্রতিবছর জলসা হতে থাকে। রাবওয়াতে নতুন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে। সেই বছর ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর লাহোরে জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নতুন কেন্দ্রের পূর্ণ প্রস্তুতি না থাকায় ১৯৪৮ সালের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালের ১৫ ও ১৬ই এপ্রিল। উক্ত জলসা অনুষ্ঠিত হয় রাবওয়ার রেলস্টেশনসংলগ্ন মাঠে। জলসায় উপস্থিতি ছিল প্রায় ১৬ হাজার। এরপর এভাবেই রাবওয়াতে জলসা হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে জলসায় লোকসমাগম বাড়তে থাকে। ১৯৮৩ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর উপস্থিতিতে পাকিস্তানে সর্বশেষ জলসা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে লোকসমাগম ছিল ২লক্ষ ৭৫হাজারেরও অধিক। এরপর পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে জলসা সালানায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় আর সরকারী বিধি-নিষেধের কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) হিজরত করে পাকিস্তান থেকে লন্ডন চলে যান এবং সেখানে কেন্দ্র স্থাপন করেন।

১৯৮৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) হিজরত করে লন্ডন চলে গেলে সেখানেই জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এটি বহাল থাকে। এরপর আরেক পরাশক্তি দেশ আমেরিকায় খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর উপস্থিতিতে ১৯৮৯ সালে ৪১তম আন্তর্জাতিক জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয় যা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এই জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইউনিভার্সিটি অফ মেরীল্যান্ড বাল্টিমুরে। এরপর ১৯৯১ সালে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কাদিয়ানে ঐতিহাসিক সফরে আসেন এবং ১০০তম সালানা জলসায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯৯১ সালে প্রথমবারের মত জলসা সালানা ইংল্যান্ডে প্রদত্ত যুগ-খলীফার বক্তৃতা সরাসরি MTA-তে সম্প্রচার করা হয়। এরপর থেকে প্রতি বছর যে জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয় তা যুগ-খলীফার উপস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিক জলসা পরিগ্রহ করে। একইসাথে আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের আহমদী সদস্যরা আন্তর্জাতিক জলসা দেখার সৌভাগ্য লাভ করছে। এছাড়া এবছর তথা ২০২১ সালে এসে ইন্টারনেটের কল্যাণে পৃথিবীর অনেকগুলো দেশ লাইভ স্ট্রিমিং-এর মাধ্যমে সরাসরি জলসায় অংশগ্রহণের স্বাদ পেয়েছে।

প্রতিবছর এই জলসায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বয়আত অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। জামা'তের সদস্যরা পূর্বকৃত দোষত্রুটি স্বীকার করে নবজীবনে পদার্পণ করার ব্রত হিসেবে যুগ-খলীফার হাতে হাত রেখে বয়আত করে থাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বৃটেনের জলসা সালানায় প্রথমবার আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন যার মাধ্যমে বিশ্বে সকল প্রান্ত থেকে নতুন ও পুরোনো আহমদীরা তওবা ও ইস্তেগফারের ঘোষণার মাধ্যমে খলীফার সাথে বয়আতের অঙ্গীকারনামা পাঠ করে। যদিও এই বরকতময় জলসা ১৮৯১ সালে কাদিয়ানে ডিসেম্বর মাসের সুযোগ-সুবিধা মাথায় রেখে শুরু হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে সারা পৃথিবীতে প্রতিটি দেশ নিজস্ব আবহাওয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের জলসার দিন ধার্য করে এবং তদনুযায়ী জলসা উদ্‌যাপন করে থাকে। প্রত্যেক আহ্‌মদী সদস্য জলসায় অংশগ্রহণ এবং জলসার বক্তব্য শ্রবণ করাকে অতিব গুরুত্বপূর্ণ জানে ও মানে। পূর্বেই বলা হয়েছে, এই জলসার ভিত্তি রেখেছিলেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), তাই তাঁর একটি বাণী এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য আর তা হল: "এ জলসায় এমনসব সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সুগভীর জ্ঞানের কথা শোনানোর আয়োজন থাকবে যা ঈমান, দৃঢ় বিশ্বাস ও ধর্মীয় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য অপরিহার্য। এছাড়া সেসব বন্ধুর জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা হবে এবং তাদের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগও দেয়া হবে আর পরম দয়ালু খোদার দরবারে যথাসাধ্য আকুতি জানানো হবে, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং নিজের জন্য মনোনীত করেন আর তাদের মাঝে যেন পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেন। এছাড়া এসব জলসার আরেকটি বাড়তি লাভ যা হবে তা হল, প্রতি বছর যেসব নতুন নতুন ভাই জামা'তে যোগ দিবেন তারা নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে তাদের পুরনো ভাইদের চেহারা দর্শন করবেন, আর একে অপরের সাথে পরিচিত হয়ে পারস্পরিক ভালবাসা ও হৃদ্যতার বন্ধনে ক্রমাগতভাবে উন্নতিলাভ করবেন। আর যে ভাই এ সময়ের মধ্যে নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যাবেন, এ জলসায় তার জন্য ক্ষমা চেয়ে দোয়া করা হবে। এছাড়া সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আর তাদের স্বভাবগত শুষ্কতা, পারস্পরিক দূরত্ব ও কপটতা দূর করার জন্য মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত খোদা তা'লার দরবারে সদয় মিনতি জানানো হবে। আর এ ঐশী জলসায় আরও অনেক আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও উপকার নিহিত রয়েছে যা ইনশাআল্লাহুল কাদীর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ পেতে থাকবে।"

(রূহানী খাযায়েন, চর্তু খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫১, ৩৫২ এবং মজমুআয়ে ইশতিহারাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০২-৩০৩)

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' ডেস্ক

জলসা সালানার গুরুত্ব ও কল্যাণ

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কল্যাণে গত ৬-৮ আগস্ট আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত বিশ্বের আহমদীরা এ জলসা উপভোগ করেছেন। এ জলসার মাধ্যমে জামা'তের সদস্যগণ নিজের ও নিজ পরিবারের আধ্যাত্মিক খোরাক মিটিয়েছেন। জলসায় আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নাম ও তাদের কথা উচ্চারণের মাধ্যমে একটি ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি হয়। আর এ দিনগুলোতে আমাদের আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যলাভের উপায় ও তাঁর শাস্তিসমূহ থেকে রক্ষা লাভের উপায় শিখানো হয়ে থাকে। যেভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ

(সূরা ইবরাহীম: ০৬)

অর্থ: আর আল্লাহ্‌র দিনগুলো এদের স্মরণ করাও। নিশ্চয় এতে একান্ত ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।

এখানে "আইয়ামুল্লাহ" বা আল্লাহ্‌র দিনগুলো বলতে আল্লাহ্‌র শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর জলসার দিনগুলোতে এ বিষয়টিই হুযূর (আই.) ও অন্যান্য বক্তাগণ আমাদের স্মরণ করিয়ে থাকেন।

জলসাকে একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মিলনমেলাও বলা যেতে পারে। ধর্মীয় এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার গুরুত্ব অপরিসীম ও এর মাঝে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ বিষয়ে মহানবী (সা.) বলেন: 'এমন অনুষ্ঠান যেখানে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে স্মরণ করা হয় সেখানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ফিরিশতারাও দোয়া করতে থাকে।' *(সহিহ মুসলিম, কিতাবুয যিকর ও দোয়া... বাব ফাযলে মাজালিসুয্ যিকর)*

অন্যত্র মহানবী (সা.) বলেন: "যখন কোন দল মসজিদে আল্লাহ্ তা'লার কিতাব তিলাওয়াত এবং তা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়, তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল হয়, (আল্লাহ্‌র) রহমত তাদের ঢেকে ফেলে এবং ফিরিশতারা তাদের ঘিরে রাখে।" *(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ক্বিরাআত)*

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ঐশী দিকনির্দেশনার আলোকে জলসা সালানা প্রবর্তন করেন। জলসা সালানা প্রবর্তনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী– এ বিষয়ে স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: "এ জলসার লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের জামা'তের সদস্যগণ যেন এভাবে বার বার পরস্পর সাক্ষাতের মাধ্যমে নিজেদের মাঝে এমন এক পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে যাতে তাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পরকালের দিকে ঝুঁকে যায়। আর তাদের ধর্মভীরুতা, তাকওয়া, খোদাভীতি, পরহেযগারী, সহানুভূতি, পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধে তারা যেন অন্যদের জন্য এক আদর্শে পরিণত হয়। নম্রতা, বিনয় ও সততা যেন তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। আর ধর্মীয় উৎকর্ষের জন্য তারা যেন চেষ্টাসাধনার পথ বেছে নেয়।" *(রূহানী খাযায়েন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৪)*

এছাড়া জলসা সালানার গুরুত্ব কী- এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: " এ জলসায় এমনসব সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সুগভীর জ্ঞানের কথা শোনানোর আয়োজন থাকবে যা ঈমান, দৃঢ়বিশ্বাস ও ধর্মীয় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য অপরিহার্য। এছাড়া সেসব বন্ধুর জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা হবে এবং তাদের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগও দেয়া হবে আর পরম দয়ালু খোদার দরবারে যথাসাধ্য আকুতি জানানো হবে, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং নিজের জন্য মনোনীত করেন আর তাদের মাঝে যেন পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি (আ.) আরও বলেন, "এসব জলসার আরেকটি বাড়তি লাভ হবে, প্রতি বছর যেসব নতুন নতুন ভাই জামা'তে যোগ দিবেন তারা নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে তাদের পুরোনো ভাইদের চেহারা দর্শন করবেন, আর একে অপরের সাথে পরিচিত হয়ে পারস্পরিক ভালবাসা ও হৃদ্যতার বন্ধনে ক্রমাগতভাবে উন্নতি লাভ করবেন।... আর এ ঐশী জলসায় আরও অনেক আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও

উপকার নিহিত রয়েছে যা ইনশাআল্লাহুল কাদীর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ পেতে থাকবে।" *(রূহানী খাযায়েন, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫১-৩৫২ এবং মজমুআয়ে ইশতিহারাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০২-৩০৩)*

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন: "এ জলসাকে জাগতিক সাধারণ সমাবেশের মত মনে কর না। এটি সেই বিষয় যার ভিত নিতান্তই সত্যের সমর্থনকল্পে ও ইসলামকে জয়যুক্ত করার নিমিত্তে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা স্বহস্তে এই ব্যবস্থাপনার গোড়াপত্তন করেছেন। আর এ লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে প্রস্তুত করে রেখেছেন, যারা এতে এসে যোগ দিবে। কেননা এটা সেই সর্বশক্তিমান খোদার কাজ যাঁর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। *(৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯২ সনের বিজ্ঞাপন, মজমুআয়ে ইশতিহারাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪২)*

জলসায় সফর করে আসা এবং নির্ধারিত জলসার দিন ধার্য করার যৌক্তিকতা কী- এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: "মৌলভীদের পক্ষ থেকে আমাকে প্রত্যাখ্যাত আখ্যা দেয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, 'তিনি কেন জলসায় যোগদানের আহ্বান জানিয়ে এমন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেন?'

হে খোদাভীতিহীন ব্যক্তিরা! চোখ খুলে পড়ে দেখ, উক্ত বিজ্ঞপ্তি যা ৭ ডিসেম্বর ১৮৯২ সালে প্রকাশ করা হয়েছিল তার বিষয়বস্তু কী? সেখানে আমি আমার জামা'তের সদস্যদেরকে জ্ঞান অর্জন, ধর্মীয় সমস্যার সমাধান, ইসলামের প্রতি সহমর্মিতা এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনার আহ্বান জানিয়েছি নাকি এতে অন্য কোন মেলা, ক্রীড়াকৌতুক কিংবা গান-বাজনার উল্লেখ আছে? ওহে বর্তমান যুগের ইসলামের ধ্বজাধারী মৌলভীরা! তোমরা কেন মহাপ্রতাপান্বিত খোদাকে ভয় কর না? এক দিন কি মরতে হবে না? নাকি তোমাদের জন্য সব শাস্তি মাফ হয়ে গেছে? সত্য কথা এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর কথা শুনে তোমাদের মাথায় তো এ চিন্তা আসে না যে, এখন আমরা আমাদের হঠকারিতা পরিত্যাগ করি বরং মামলায় পারদর্শী ব্যক্তিদের লোকদের ন্যায় তোমাদের ভাবনা হল, কথা বানিয়ে হলেও কীভাবে সে বিষয়টির খণ্ডন করা যায় যাতে লোকেরা না বলে, আমাদের মৌলভী সাহেবদের কোন উত্তর জানা নেই। এতটা ঔদ্ধত্য, বিশ্বাসঘাতকতা, কার্পণ্য ও বিদ্বেষ কোন্ বয়সে শোভা পায়? ফতোয়া দেয়ার সময় আপনাদের ঐ হাদীসসমূহ কি স্মরণ হয় নি যেখানে বলা হয়েছে, ধর্মীয় জ্ঞানার্জন, সন্দেহ ও সংশয় নিরসন এবং আপন ধর্মীয় ভাই ও আত্মীয়স্বজনের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কৃত সফর অধিক পুণ্য ও মহান প্রতিদান লাভের কারণ সাব্যস্ত হয়? উপরন্তু পুণ্যবানদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সফর করা পুণ্যবানদের চিরাচরিত রীতি আর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কেয়ামতের দিন যখন এক ব্যক্তি তার অপকর্মের কারণে ভয়াবহ শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হবে তখন মহা প্রতাপশালী আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি অমুক পুণ্যবান ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কখনও গিয়েছ? সেই ব্যক্তি উত্তরে বলবে, ইচ্ছাকৃতভাবে তো কখনও যাই নি কিন্তু একবার পথিমধ্যে তার সাথে সাক্ষাত হয়েছিল। তখন খোদা তা'লা বলবেন, যাও বেহেশতে প্রবেশ কর কেননা আমি সেই সাক্ষাতের কারণে তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

অতএব হে সংকীর্ণমনা মৌলভীরা! একটু চোখ বুলিয়ে দেখ, উক্ত হাদীস কী প্রেরণা দিচ্ছে? আবার কারও মনে যদি এই ধাঁধা থাকে যে, আমি এই ধর্মীয় জলসার জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন কেন ধার্য করেছি এবং এমন কাজ মহানবী (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনী থেকে কোথায় প্রমাণিত হয়? এর উত্তর হল, বুখারী এবং মুসলিম শরীফ পড়ে দেখ, বেদুইনরা মহানবী (সা.)-এর কাছে ধর্মীয় বিষয়ে সমাধান জানার জন্য নিজেদের অবসর সময়ে আসতেন আর কতক বিশেষ বিশেষ মাসে তাদের দল অবসর পেলেই মহানবী (সা.)-এর কাছে আসতো। সহীহ বুখারীতে হযরত আবু জামরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন,

إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِي شَهْرِ الْحَرَامِ

'আব্দুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদল মহানবী (সা.)-এর সকাশে এসে উপস্থিত হল এবং তারা বলল, আমরা দূরের সফর করে এসেছি আর হারাম (পবিত্র) মাস ছাড়া আমাদের এখানে আসা সম্ভব না' কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে নিষেধ করেন নি এবং তাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। অতএব উক্ত হাদীস থেকে এটি সাব্যস্ত হয় যে, যারা জ্ঞানার্জন কিংবা ধর্মের খাতিরে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজেদের কোন অনুসরণীয় ব্যক্তির সেবায় উপস্থিত হতে চায়, তারা নিজেদের সুযোগ-সুবিধামত একটি নির্দিষ্ট দিন ঠিক করতে পারে যে দিন তারা সহজেই কোন সমস্যা ছাড়া উপস্থিত হতে পারে, আর এই বিষয়টি বিবেচনা করে ২৭ ডিসেম্বর দিনটি নির্ধারণ করা হয়েছে কেননা এই দিনটি ছুটির দিন আর চাকুরিজীবীরা সহজেই এই দিনে আসতে পারে। এছাড়া খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, এ ধর্মে কোন সমস্যার বিষয় রাখা হয় নি- এটি এ কথার দিকে ইঙ্গিত করে যে, উদাহরণস্বরূপ কোন পরিকল্পনা অথবা ব্যবস্থাপনার দ্বারা যদি একটি কাজ যা মূলত বৈধ, ধারাবাহিক এবং সহজসাধ্য হতে পারে তাহলে সেই পরিকল্পনা গ্রহণ কর- এতে কোন সমস্যা নেই। এই বিষয়ের নাম বেদআত রাখা সেই সকল অন্ধের কাজ, যাদের ধর্মীয় জ্ঞানও নেই আবার তাদেরকে জাগতিক জ্ঞানও প্রদান করা হয় নি।" *(রূহানী খাযায়েন, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬০৮-৬০৯)*

খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল-মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জলসার গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

"পবিত্র কুরআনেও বিবৃত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর যুগেও এমন কিছু লোক সভায় উপস্থিত হত যারা কেবল একে অপরের দেখাদেখি সেখানে চলে আসতো। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে সবাইকে দেখা যায় আর সাহাবীরাও তাদেরকে দেখতেন কিন্তু আলোচনা শুরু হওয়ার সাথে সাথে দৃষ্টির অগোচরে চলে যেতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের সম্পর্কে বলেন, **"কাদ ইয়া'লামুল্লাহুল্লাযীনা ইয়াতাসাল্লালূনা মিনকুম লিওয়াযা"** অর্থাৎ যারা তোমাদের দৃষ্টির অগোচরে সভা থেকে পলায়ন করে আল্লাহ্ তাদেরকে খুব ভালভাবে চিনেন। এমন লোকদেখানো সদস্য এখানেও থেকে থাকবেন। কিন্তু এমনও অনেক লোক আছেন যারা এর সঠিক গুরুত্ব বুঝেন না। তারা জানেন না, তাদের এই কৃতকর্ম আসলে কেমন। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) একবার বক্তৃতা করছিলেন, সেখানে তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে অবগত করেছেন, এই সভায় এমন এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয়েছে যে এখানে এসে এই সভাকে মানুষে পরিপূর্ণ দেখতে পেয়েছে। তার কাছে অনেক কষ্টে আওয়াজ যাচ্ছিল। কিন্তু যিকরে ইলাহী বা আধ্যাত্মিক আলোচনা হচ্ছে তাই এ সভা থেকে চলে যাওয়া সমীচীন হবে না– এই ভেবে লোকলজ্জায় এই ব্যক্তি সেখানেই বসে গেল। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমিও তাদের সাথে তার গুনাহ্‌র ক্ষেত্রে লজ্জা প্রকাশ করব অর্থাৎ উপেক্ষা করব আর তার পাপের কারণে তাকে পাকড়াও করব না। এরপর আরেক ব্যক্তি আসল, সে এসে দেখলো এই সভায় বসারই কোন স্থান নেই। এদিক সেদিক খোঁজাখুজির পর এমন এক স্থানে বসে পড়ল যেখান থেকে কেবল আওয়াজ শুনা যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যেভাবে একই ব্যক্তি চেষ্টা প্রচেষ্টা করে জায়গা সন্ধানের জন্য সামনে এগিয়ে এসেছে তেমনি আমিও তাকে আমার নিকটে নিয়ে আসব। এরপর তৃতীয় এক ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অবগত করেন, সে ব্যক্তি উপস্থিত হল কিন্তু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না দেখে ফিরে চলে গেল। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যেভাবে এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকিরের এই সভা থেকে ফিরে চলে গেছে তেমনি আমিও তার থেকে বিমুখ হয়ে যাব এবং তার জন্য আমার রহমতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করব না।"

অতএব, উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে যে কোন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সভায় বসা এবং মনোযোগের সাথে তা শোনার গুরুত্ব ও কল্যাণ সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এ ধরনের সভায় জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি খোদা তা'লার নৈকট্য, ভালবাসা ও রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হয়। তাই এ ধরনের ধর্মীয় সভা ও জলসাসমূহ থেকে আমাদের কল্যাণমণ্ডিত হবার চেষ্টা করা উচিত।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) জলসার গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে উল্লেখ করার পাশাপাশি এই মহতী জলসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য দোয়ার এক ভাণ্ডারও উন্মুক্ত করে গিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন: পরিশেষে এ দোয়া করে আমি ইতি টানছি– প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যিনি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করবেন, খোদা তা'লা তাদের সাথী হোন, তাদের মহা পুরস্কারে ভূষিত করুন, তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন, আর তাদের সব সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবস্থা তাদের অনুকূলে সহজ করে দিন, তাদের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দূরীভূত করে দিন আর তাদের সব ধরনের কষ্ট থেকে মুক্তি দান করুন, তাদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে দিন আর পরকালে তাদেরকে তাঁর সেসব বান্দার সাথে পুনরুত্থিত করুন যাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা সদা বিরাজমান। আর তাদের এই সফর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তিনি তাদের স্থলাভিষিক্ত হোন। হে মহামর্যাদাবান, হে দাতা ও পরম দয়ালু খোদা, হে সমস্যা-নিরসনকারী খোদা! আমার এসব দোয়া কবুল করে নাও আর আমাদের বিরোধীদের বিপক্ষে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী দিয়ে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর কেননা সর্বশক্তি ও সামর্থ্যের একমাত্র অধিকারী তুমিই। আমীন, সুম্মা আমীন"। *(৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯২ সনের বিজ্ঞাপন, মজমুআয়ে ইশতিহারাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪২)*

অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ দোয়াসমূহ দ্বারা জলসার কল্যাণরাজি আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। আমরা যারা নিজেদের জ্ঞানগত, চারিত্রিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কামনা করি তাদের জন্য এ মহতী জলসা উন্নতির সোপানস্বরূপ। এছাড়া এ জলসার মাধ্যমে আমরা নিজেদের তাকওয়া, ইবাদত, দোয়া করার অভ্যাস ও খোদার প্রতি ভরসা করার মানকে উন্নীত করতে পারি ও অন্যদের জন্য তা দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করতে পারি।

সর্বোপরি, আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রিয়ভাজন হবার জন্য ও তাঁর (আ.)-এর দোয়ার অংশীদার হবার জন্য এ মহতী জলসার গুরুত্ব বর্ণনাতীত। এ মহতী জলসা যার গোড়াপত্তন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে মসীহ্ মাওউদ (আ.) করেছিলেন তা কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে ইনশাআল্লাহ্। আর আহমদী-অআহমদী নির্বিশেষে এ জলসার আশিস ও কল্যাণ লাভ করতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। তাই আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা যেন নিজেরা এ জলসার গুরুত্ব ও কল্যাণ উপলব্ধি করতে পারি ও নিজ বংশধরদের এ জলসা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হবার জন্য উৎসাহিত করতে পারি, আমীন।

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' ডেস্ক

জলসা সালানা, ইউ. কে. ২০২১-এ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে MTA'র মাধ্যমে যোগদান

বকশিবাজার, ঢাকা (সরাসরি)

নারায়ণগঞ্জ (সরাসরি)

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (সরাসরি)

চট্টগ্রাম (সরাসরি)

আশকোনা, ঢাকা

আহমদনগর, পঞ্চগড়

গাজীপুর

ঘড়িলাল

জামালপুর

তারুয়া

দিলালপুর

নাসেরাবাদ, কুষ্টিয়া

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়আতকারী সর্বন্তকরণে এ কথার অঙ্গীকার করবে, এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত শির্ক থেকে সে বিরত থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপদৃষ্টি, সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার, অন্যায়, খিয়ানত এবং নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করে চলবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর কাছে পরাভূত হবে না।

৩

খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায পড়বে। আর যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ও প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের এবং নিজ পাপসমূহের জন্য প্রত্যহ ক্ষমাপ্রার্থনা ও ইস্তেগফার করার স্থায়ী অভ্যাস করবে। আন্তরিক ভালবাসার সাথে খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ রেখে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে।

৪

প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে আর বিশেষকরে মুসলমানদেরকে কথায়, কাজে অথবা অন্য কোনভাবে অন্যায় কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে-কাঠিন্যে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিতে ঐশী সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে। তাঁর পথে সকল প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখকষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি বিমুখ হবে না বরং সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে।

৬

সামাজিক কদাচার ও কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করবে। কুরআনের অনুশাসন শতভাগ শিরধার্য করবে এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলীকে নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যবিধি হিসেবে অবলম্বন করবে।

৭

অহঙ্কার ও দম্ভ সর্বতোভাবে পরিহার করবে। নম্রতা, বিনয়, সদাচরণ, সহনশীলতা ও দীনতার সাথে জীবনযাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম, সন্তানসন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের সেবায় রত থাকবে এবং খোদাপ্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ে মানবজাতির যথাসাধ্য হিতসাধন করবে।

১০

শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মা'রুফ তথা ধর্মানুমোদিত সকল আজ্ঞা পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এতে অটল থাকবে। আর এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে এমন মহান পর্যায়ে উপনীত থাকবে যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোন সম্পর্ক ও বন্ধনে অথবা তাবৎ সেবকসুলভ অবস্থার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ: ১২ জানুয়ারি, ১৮৮৯ইং)

জলসা সালানা, ইউ. কে. ২০২১-এ হুযূর (আই.)-এর রুটি প্লান্ট পরিদর্শন

জলসা সালানা, ইউ. কে. ২০২১-এ স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মযজ্ঞ

New Vol. No. 84 | 3rd Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th August, 2021 | Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলসা সালানা, ইউ. কে. ২০২১-এ উড্ডীনরত বিভিন্ন দেশের পতাকা আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান পরিগ্রহ করেছে

জলসা সালানা, ইউ. কে. ২০২১-এ উপস্থিত দর্শকের একাংশ

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Sheikh Mostafizur Rahman**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)